আয়ুর্বেদে মনোদর্শন

(তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত)

ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী

ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা :: ১৯৫৮

প্রকাশক ঃ
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৮

মুদ্রক ঃ
শ্রীহরলাল বর্ধন
বর্ধন প্রেস
৮।৪এ, কাশী ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্‌ ব্যাপ্যস্থিতাজগৎ
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

লেখকের নিবেদন

'আয়ুর্বেদে মনোদর্শন' পুস্তকে যাহা আলোচ্য তাহা পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। তাহা সত্ত্বেও ভূমিকার একটু প্রয়োজন আছে, তাহাই নিবেদন করিতেছি।

১। এই গ্রন্থের নাম দিয়াছি 'আয়ুর্বেদে মনোদর্শন'। কেন? আধুনিক পরিভাষা অনুসারে মনোবিদ্যা বা মনস্তত্ত্বের অধিকার যেটুকু আলোচনা বা ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ, আয়ুর্বেদে মন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সে সীমারেখা অতিক্রম করিয়া অনেকগুলি স্থানেই দর্শনশাস্ত্রের সীমানায় প্রবেশ করিতে হইয়াছে। সেক্ষেত্রে মনোবিদ্যা বা মনস্তত্ত্ব নাম দিলে অতটা গভীর ভাব প্রকাশ করে না। সেইজন্যই এই নামকরণ। মন সম্বন্ধে আয়ুর্বেদাচার্যগণের মতবাদ স্বভাবতঃই আধুনিক মনোবিদ্যা হইতে অনেক স্থানেই অন্যরূপ। সেইজন্যও এই নাম দিয়াছি।

২। সমগ্র গ্রন্থখানিকে আধুনিক মনোবিদ্যার ধরনে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করিয়াছি। ইহাতে মনের রূপ, ক্রিয়া, শরীরের সহিত মনের সম্পর্ক, মনের সুস্থতা, অসুস্থতা, ব্যক্তিত্ব, স্মৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভের সুবিধা হইবে।

৩। অধ্যায় বিন্যাস আধুনিক মনোবিদ্যার ধরনে করিলেও তাহার সহিত তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করিনাই। তাহা আমার উদ্দেশ্যও নহে। আয়ুর্বেদে মন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও দর্শন গ্রথিত করিয়া তাহারই ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ ও বিচারের চেষ্টা করিয়াছি।

৪। সামান্য সামান্য আধুনিক মতবাদ প্রাসঙ্গিক ভাবেই উত্থাপন করিয়াছি। বর্ত্তমান যুগের পাঠকগণই এই পুস্তক পড়িবেন, কাজেই এই প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তাঁহাদের পক্ষে গ্রন্থখানি সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য হইবে এই ধারণাতেই এই সন্নিবেশ। প্রাসঙ্গিক আলোচনা বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছি। পাদটীকায় দেইনাই। পুস্তকপাঠের সহজধারা পাদটীকায় বাধা পায়; এজন্যই পাদটীকা বর্জ্জন করিয়াছি।

৫। একমাত্র মানসিক ব্যাধির অধ্যায়ে আধুনিক মনোবিদ্যাসম্মত মনোবিকার সম্বন্ধে কিছু তুলনামূলক আলোচনা উপস্থিত করিয়াছি। যাঁহারা

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞান হিসাবে পাঠ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে এই আলোচনা সুফলদায়ক হইবে।

এই অধ্যায় প্রকৃতপক্ষে যতটা প্রয়োগগত মূল্য বহন করে তত্ত্বগত মূল্য তাহার অপেক্ষা অনেক কম। সে হিসাবে আধুনিক বিদ্যার সহিত একত্রে আলোচনায় সম্যক জ্ঞানের সহায়ক হইবে। আমি অল্পবুদ্ধির ব্যক্তি অথচ বিপুল বুদ্ধির করণীয় কাজে হাত দিয়াছি। সাফল্য যে কতদূর হইল তাহার বিচার পণ্ডিতগণ করিবেন।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—

সহস্রশো যে বিচিন্ত্যমানা
বিমলবিপুল বুদ্ধেরপিবুদ্ধিমাকুলীকুর্য্যুঃ
কিং পুনরল্পবুদ্ধেঃ।

অনেক কিছুই হয়ত উদ্ধার করিতে পারি নাই, তবুও চেষ্টা করিয়াছি। সাফল্য বা অসাফল্যের বিচারের ভার পণ্ডিতগণের হাতে ন্যস্ত করিলাম।

—বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী

পরিচিতি

ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এলোপ্যাথ চিকিৎসক। অথচ তিনি তাঁর পিতার কাছে দীর্ঘকাল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা কবিরাজ ৺বঙ্কিমচন্দ্র বাগচি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং অনেক ছাত্রই তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেছেন এবং প্রায়োগিক চিকিৎসায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন।

সুলেখক রূপেও ডাঃ বাগচির খ্যাতি আছে। একজন এলোপ্যাথ চিকিৎসক যদি আয়ুর্বেদজ্ঞ ও সুলেখক হন তাহলে তাঁর কাছ থেকে লোক যতটা উচ্চমানের আয়ুর্বেদগ্রন্থ রচনা আশা করতে পারে, তাঁর বর্তমান গ্রন্থ 'আয়ুর্বেদে মনোদর্শন' ঠিক ততটাই উচ্চমানের। তিনি এলোপ্যাথি ও ভারতীয় আয়ুর্বেদের বিষয় সংমিশ্রণে কোনও বর্ণসংকর বিদ্যার জন্মদানে সচেষ্ট হননি। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনি চিরাচরিত আয়ুর্বেদের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে আধুনিক যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন; এবং আমাদের মতন সাধারণ পাঠকের মনে হয়েছে তাঁর প্রচেষ্টা পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। আয়ুর্বেদের বিশুদ্ধি রক্ষা করে কী ভাবে তাকে যুগোপযোগী রূপ দেওয়া যায়, এ বিষয়ে তিনি একজন পথিকৃৎ। তাঁর গ্রন্থ চরকসংহিতা, বাগভট, ডলহন্, ভাবমিশ্র, এবং শার্ঙ্গধর রচিত বিভিন্ন আকর গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনমত গৃহীত বহু উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ, এবং ঐসব উদ্ধৃতির প্রতিটির বঙ্গানুবাদ করে তিনি আধুনিককালের আয়ুর্বেদ-শিক্ষার্থীদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। কেবল তাই নয়, আয়ুর্বেদ-অজ্ঞ এলোপ্যাথ চিকিৎসক এবং সাধারণ শিক্ষিত জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয় আয়ুর্বেদবিদ্গণ কতটা উন্নতমানের চিকিৎসাশাস্ত্র রচনা করে গেছেন।

সঙ্গত কারণেই সরকার এখন আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনে সর্বতোভাবে যত্নশীল। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে এই শাস্ত্রের পঠনপাঠনে এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে এর সুষ্ঠু প্রয়োগে সরকার বদ্ধপরিকর। অথচ বাংলা ভাষায় রচিত আয়ুর্বেদ-গ্রন্থের এখন একান্ত অভাব। প্রাচীন চরকসংহিতাদির একদাকৃত বাংলা

অনুবাদও এখন অতি দুর্লভ। এই অবস্থায় এক দিকে যেমন প্রয়োজন ঐ সব অনুবাদগ্রন্থের পুনঃসংস্করণ, তেমনই অন্যদিকে প্রয়োজন নূতন নূতন প্রকরণগ্রন্থ রচনা। ডাঃ বাগচির বর্তমান গ্রন্থ এই উভয় প্রয়োজনই মেটাতে সক্ষম।

ডাঃ বাগচি মানসিক বিকৃতির চিকিৎসার দিকেই লক্ষ্য রেখে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সব বিকৃতি 'রোগ' পর্যায়ে পড়ে না। তবুও রোগচিকিৎসা প্রসঙ্গে উপান্তবর্তী যাবৎ বিকৃতির স্বরূপ, নিদান ও চিকিৎসা জ্ঞানের প্রয়োজন। গ্রন্থকারের মূল লক্ষ্য সেই দিকেই। মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যে আজকাল বহু জ্ঞানগর্ভ গবেষণা চলেছে এবং তার উপর নির্ভর করে ঐসব বিকৃতির চিকিৎসা এবং যাতে ঐসব বিকৃতি না ঘটতে পারে তার ব্যবস্থা বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজ এবং তাঁদের অনুকরণে ভারতীয় এলোপ্যাথ সমাজ সক্রিয়ভাবে চেষ্টিত। এমত সময়ে প্রাচীন ভারতীয়েরা সূক্ষ্ম এবং বহুপ্রসারী দৃষ্টি ও বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সব সত্য উদ্ঘাটন করেছেন এবং বিভিন্ন প্রকার মানসিক বিকৃতির দূরীকরণে ও প্রাক্-নিরাকরণে যেসব ব্যবস্থা দিয়েছেন, সেগুলি যদি আধুনিক চিকিৎসক-সমাজে সবিশেষে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের ফলেই ভারতীয়েরা 'আধুনিক ভারতীয় মানসিক-চিকিৎসা-বিজ্ঞান' গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন।

এলোপ্যাথ চিকিৎসাবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্ত্য পরিবেশে। একেবারে মূল কথাগুলি বাদ দিলে ঐ বিজ্ঞানের অনেক তথ্য এবং ব্যবস্থা ঐ সব দেশের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে এমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত যে, তাদের অন্ধ অনুকরণে সুফলের পরিবর্তে কুফল লাভের সম্ভাবনা বেশি। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসার প্রয়োগে দীর্ঘকাল এদেশে এই কুফল লাভ ঘটেছে। ওদের ব্যবস্থামত ঔষধ প্রস্তুত-করণে নানা দিক দিয়ে লাভবান হয়েছে ওরাই এবং লোকসানের বোঝা বহন করেছি আমরা। এতদিনে আমাদের কিছু কিছু চৈতন্য হয়েছে—ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা ভারতীয় পরিবেশ অনুযায়ী এলোপ্যাথি-বিজ্ঞান ও তদ্ভিত্তিক ঔষধ-প্রণয়ন-পদ্ধতির পুনঃরূপায়ন করেছেন। ঠিক এই সময়ে যদি আমাদের নিজেদের আয়ুর্বেদ, তৎসম্মত ঔষধাবলী ও তাদের প্রণয়ন-পদ্ধতি লোকসমক্ষে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে এ দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। ডাঃ বাগচির 'আয়ুর্বেদে মনোদর্শন-জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশে এ জাতীয় কল্যাণসাধন দ্রুততর হবে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে ভারতীয় আয়ুর্বেদের মৌল পার্থক্য এই যে, ভারতীয় আয়ুর্বেদ মানব-সত্তার এক পূর্ণাঙ্গ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। রোগী একজন মানুষ, মোটরগাড়ির মতন নির্জীব বস্তু নয়। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে দীর্ঘকাল ধারণা ছিল যে, রোগী একটি 'বস্তু'-বিশেষ যা সম্পূর্ণ পরিচালিত হয় বাইরের প্রভাবে। বাইরের প্রভাবেই তার যাবৎ রোগ এবং বাইরে থেকে প্রযুক্ত ঔষধের প্রভাবেই রোগমুক্তি। কালক্রমে অবশ্য পাশ্চাত্ত্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, বিভিন্ন রোগীর বিভিন্ন প্রকার 'reaction' তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছে। তাঁরা এই 'reaction' ব্যাপারটির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম স্নায়বিক ক্রিয়া, সূক্ষ্ম 'gland'-আদির ক্রিয়া, ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অনেক কথা এনেছেন। তবুও কিন্তু এগুলিকে তাঁরা সেই একই দৃষ্টিতে—তাঁদের 'প্রকৃতি-বিজ্ঞানের' দৃষ্টিতে দেখেছেন। মানবসত্তা বলে একান্ত ভিন্ন কোন এক বিশেষ সত্তা তাঁরা মানছেন না। আমাদের আয়ুর্বেদ কিন্তু প্রথমেই এই অন্যবিলক্ষণ মানব-সত্তার বিচার করেছেন। আয়ুর্বেদ মূলতঃ মানব-সত্তার দার্শনিক বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানব-সত্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মত। এদের মধ্যেকার একটি বিশিষ্ট মতের উপর আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠিত। মতটি হল সাংখ্য মত। তাও আবার বিশেষ এক সাংখ্যসম্প্রদায়ের মত। সেই সম্প্রদায়ের মূল কথা হল এই যে, মানব-সত্তার দু'টি দিক আছে—একটি হল জীবন্ত দেহের, অন্যটি হল চেতন মনের দিক এবং এ দু'টি নিবিড় ভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট। জীবন্ত দেহের বিশ্লেষণে তাঁরা পেয়েছেন তিন মৌলিক তত্ত্ব—বায়ু, পিত্ত ও কফ এবং চেতন মনের গঠনে তাঁরা পেয়েছেন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। দেহের ক্ষেত্রে সুস্থতার কারণ হল বায়ু, পিত্ত ও কফের সাম্যাবস্থা —অর্থাৎ কোনটারই মাত্রাধিক প্রাধান্য নয় এবং মনের সুস্থতা সেই অবস্থা, যে অবস্থায় সত্ত্বের প্রাধান্য রক্ষিত হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফের নানাবিধ অসাম্য (imbalance) হেতু নানাবিধ রোগের উৎপত্তি (অর্থাৎ অস্বাস্থ্য), এবং রজঃ ও তমঃ-এর নানাবিধ অবাঞ্ছিত প্রাধান্যহেতুই নানাবিধ মানসরোগের উৎপত্তি। এইগুলি তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেছেন এবং বলেছেন, যে উদ্ভিজ্জ জঙ্গমপ্রাণিজ ও ধাতব পদার্থের প্রয়োগে বায়ুপিত্তকফের সাম্য এবং মনোরাজ্যে সত্ত্বপ্রাধান্য (যতটা সম্ভব) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলিই হল

ঔষধ। আবার সাম্য ও সত্ত্বপ্রাধান্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কেবল যে এই জাতীয় ঔষধ প্রয়োগের ফলেই হয় এমন নয়, শুচিতা, সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন, এমন কি মণিমন্ত্রাদির প্রয়োগ ও যোগাভ্যাসের ফলেও ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। এই দার্শনিক ভিত্তির উপরেই সমগ্র আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আয়ুর্বেদবিশারদগণ যাবৎ রোগের ও রোগনিরাকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বিভাগ করেছেন। এ ছাড়া বিশাল শল্য ও শলাকাচিকিৎসা তো আছেই।

গোলমাল বাধে আধুনিক দৃষ্টিতে এই বায়ুপিত্তকফ, সত্ত্বরজতমঃ, বায়ুপিত্তকফের সাম্যাবস্থা বা অসাম্য এবং সত্ত্বরজতমঃ-এর ক্ষেত্রে সত্ত্ব বাদে যে কোন একটি বা দুটির অবাঞ্ছিত প্রাধান্য ইত্যাদি বলতে আমরা কী বুঝব তাই নিয়ে। প্রাচীন ভিষগাচার্যদের কাছে এটা কোন সমস্যাই নয়, কেননা তাঁরা সেই প্রাচীন সম্প্রদায়েই রয়ে গেছেন। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত আমরা, যারা প্রাচীনত্বের এই দিকটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি, তাদের কাছে এটাই প্রধান সমস্যা। এগুলি সম্বন্ধে কল্পিত অনেক কথা বলে এদের 'hypotheses' (প্রকল্প) রূপে গ্রহণ করে তদ্ভিত্তিক সুসমঞ্জস শাস্ত্র 'theory' রচনা করা যায়, এবং সার্থক প্রয়োগে প্রকল্পগুলি অপ্রমাণও হতে পারে। এই পদ্ধতিতেই পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাশাপাশি আমাদের আয়ুর্বেদকে রেখে তুলনামূলক সমালোচনাও করা যেতে পারে। কিন্তু আয়ুর্বেদের বৈশিষ্ট্য এই যে এই শাস্ত্র কেবল প্রকল্পভিত্তিক নয়। আয়ুর্বেদের মৌলতত্ত্বগুলি কেবল বিচারসহ নয়, সেগুলি অনুভূতিলভ্যও বটে। সকলেই যে সেগুলি অনুভূতিতে ধরতে পারবেন, এমন কথা অবশ্য এখানে নেই। কিন্তু মহাপুরুষেরা যোগপ্রভাবে তা পারেন, এবং যাঁরা তা পারেন না তাঁরা এঁদের কথা মেনে নেবেন এবং সম্ভব হলে অনুভূতিতে ধরবার চেষ্টা করবেন। এর নামই শব্দপ্রমাণলব্ধ জ্ঞান এবং এইজন্য ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের নাম আয়ুর্বেদ।

অনুভূতিতে ধরার চেষ্টাই যদি আকাঙ্ক্ষিত হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে, জিনিষগুলি কি? ডাঃ বাগচি তাঁর গ্রন্থের 'প্রাক্‌কথন' এবং প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে বায়ুপিত্তকফ এবং সত্ত্বরজতমঃ সংক্রান্ত এই সব প্রশ্ন এবং এদের উত্তরের সুন্দর বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের মতন সাধারণ পাঠকের চক্ষু তিনি অনেকটা উন্মীলিত করেছেন। যদি তাঁর ব্যাখ্যানে কিছু ত্রুটি-প্রমাদ থাকে, একমাত্র নিষ্ণাত আয়ুর্বেদীই তা ধরতে পারবেন। ডাঃ বাগচির

কৃতিত্ব এই যে, তিনি পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানস্বীকৃত তত্ত্বাবলীর সাহায্যেই এই সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তাঁর গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য হল মানসিক বিকৃতির লক্ষণ, বিভাগ, নিদান ও নিরাময় বিচার। গ্রন্থের বাকি অধ্যায়গুলিতে তিনি এই কাজ করেছেন এবং ঠিক একই পদ্ধতি (অর্থাৎ আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝবার চেষ্টা) অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছেন। ছত্রে ছত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও তুলনামূলক আলোচনায় তাঁর কৃতিত্বের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। 'মনের সংজ্ঞা' শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁর বিচার্য বিষয় হল মনের সংজ্ঞা ও ভোগ্য (experiencable) বিষয় (object)। পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন মনের ক্রিয়া, অধিষ্ঠান, উৎপত্তি ও ক্রমবৃদ্ধি। তৎপরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন সুস্থ মনের লক্ষণ ও অসুস্থতার কারণ এবং এই প্রসঙ্গে এনেছেন 'অতিযোগ', 'হীনযোগ' ও 'অযোগের' বিচার। পর পর অবশিষ্ট কয়েকটি অধ্যায়ে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃতি, স্মৃতি ও প্রত্যয়, স্বপ্নদর্শন, এবং মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি, প্রকারভেদ ও লক্ষণাবলী। শেষ অধ্যায়ে (পরিশিষ্ট) তিনি দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মনোবিদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যে-সব কথা বলেছেন তাতে আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং সহজ সুরুচিপূর্ণ তুলনামূলক আলোচনার ক্ষমতা অতিস্ফুট।

গ্রন্থটি পাঠ করে আয়ুর্বেদের ছাত্র, অধ্যাপক, প্রবীণ আয়ুর্বেদবিশেষজ্ঞ ও সাধারণ শিক্ষিত পাঠক, এমন কি পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানাভিমানী, সকলেরই দৃষ্টি প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের মহত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হবে। প্রকরণ গ্রন্থের অভাবে ছাত্র ও অধ্যাপকদের যে অসুবিধা চলেছে তাও অনেক পরিমাণে দূর হবে।

যথাশীঘ্র সম্ভব এই গ্রন্থের প্রকাশ এবং এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের প্রকাশ একান্ত কাম্য। উদ্ধৃতিবহুল হওয়ায় গ্রন্থটির প্রামাণ্য স্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি উদ্ধৃতির সঙ্গে বঙ্গানুবাদ থাকায় পাঠকমাত্রেরই আকর গ্রন্থাবলীর সহিত অনেক পরিমাণে সাক্ষাৎ-পরিচয় সাধিত হবে।

শান্তিনিকেতন
১৯শে জানুয়ারী,
১৯৭৭

—কালিদাস ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

লেখকের নিবেদন	... ...	[ঙ]
পরিচিতি ঃ অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য	...	[ছ]
প্রথম অধ্যায় ঃ প্রাক্ কথন	...	১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ প্রারম্ভিক সূত্র	...	৫
তৃতীয় অধ্যায় ঃ মনের সংজ্ঞা	...	১২
চতুর্থ অধ্যায় ঃ মনের অধিষ্ঠান	...	১৯
পঞ্চম অধ্যায় ঃ মনের উৎপত্তি ও ক্রমবৃদ্ধি	...	২৪
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সুস্থ মন ও মনের অসুস্থতার কারণ		৩২
সপ্তম অধ্যায় ঃ ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃতি		৪৩
অষ্টম অধ্যায় ঃ স্মৃতি, প্রত্যয় এবং প্রত্যয়ের উদাহরণ সকল		৬৩
নবম অধ্যায় ঃ স্বপ্ন দর্শন	...	৭৬
দশম অধ্যায় ঃ মানসিক ব্যাধি		৯৩
পরিশিষ্ট ঃ	... ...	১০৯

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্ কথন

মন সম্বন্ধে জ্ঞান, যাহাকে মনোবিদ্যা বলা হয় তাহার সম্বন্ধে বহু প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জ্ঞানিগণ নানারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচনা ও বিশ্লেষণেরও শেষ নাই। ভারতবর্ষও তাহার ব্যতিক্রম নহে। মন সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শন, তন্ত্র, বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে প্রচুর আলোচনা ও বিশ্লেষণ আছে। অত্যন্ত উচ্চস্তরের ও জটিল বিশ্লেষণ আলোচনা ও মীমাংসা এই সব শাস্ত্রে দেখা যায়। মন কি, মনের ক্রিয়া কি, মনের সহিত আর কি কি সংযুক্ত, কিভাবে মনের উর্ধ্বগতি হইয়া চরম স্তরে পৌঁছাইতে পারে এই সমস্তই ঐ সব গ্রন্থের উপজীব্য। তবুও কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মনোবিদ্যাকে পৃথক শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করিয়া সামগ্রিক আলোচনা করিবার প্রচেষ্টা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কার্য। পূর্বেকার জ্ঞানিগণ তাঁহাদের রচিত ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে অন্যান্য বিষয় আলোচনার অঙ্গ হিসাবেই মন সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণাসকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আয়ুর্বেদে এই মনোবিজ্ঞানকে কিভাবে আয়ুর্বেদাচার্যগণ তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত দিক হইতে বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে পৃথক কোন পুস্তক নাই। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-বিজ্ঞান। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী কাহাকে চিকিৎসা করা হইবে অর্থাৎ কে চিকিৎসাযোগ্য, এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলিয়াছেন—চিকিৎসিত হইবে পুরুষ এবং এই পুরুষের জন্যই আয়ুর্বেদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই যে সংজ্ঞা-নির্ণীত পুরুষ—এ কে ?

ইহার উত্তরে মহর্ষি আত্রেয় বলেন—

সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতৎ ত্রিদণ্ডবৎ।
লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাৎ তত্র সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।

স পুমাংশ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং স্মৃতম্‌ ।
বেদস্যাস্য তদর্থং হি বেদোঽয়ং সম্প্রকাশিতঃ ।
(চরক সংহিতা, সূত্র স্থানম্‌—প্রথম অধ্যায়, দীর্ঘঞ্জীবতীয় অধ্যায়, শ্লোক ২০)

মন, আত্মা ও শরীর এই তিনটি যেন তিনখানি দণ্ড। এই তিনের সংযোগেই পুরুষ সৃষ্ট। আবার এই পুরুষেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। পুরুষই চেতন এবং পুরুষের জন্যই আয়ুর্বেদ প্রকাশিত হইয়াছে।

সুশ্রুত বলেন—

পঞ্চমহাভূত শরীরিসমবায়ঃ পুরুষ ইতি।
স এব কর্মপুরুষশ্চিকিৎসাধিকৃতঃ ।।
তস্য সুখদুঃখেচ্ছা দ্বেষৌ প্রযত্নঃ
প্রাণাপানাবুন্মেষনিমেষৌ বুদ্ধির্মনঃ সংকল্পো
বিচারণা স্মৃতি বিজ্ঞানমধ্যবসায়ো
বিষয়োপলব্ধিশ্চ গুণাঃ ।।
(সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান—১ম অধ্যায়, সর্বভূত চিন্তা শারীর অধ্যায়, শ্লোক ৭।৮)

এই পঞ্চ মহাভূত এবং দেহী এই সকলের সমবায়ে গঠিত বস্তুকে পুরুষ বলা হয়। এই পুরুষই চিকিৎসাধিকৃত কর্মপুরুষ। চিকিৎসাধিকৃত পুরুষ বলিতে জীবিত মানব সত্তাকে বোঝায়। ইহাতে লিঙ্গভেদ নাই অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই একই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, প্রাণ, অপান, উন্মেষ, নিমেষ, বুদ্ধি, মন, সংকল্প, বিচার, স্মৃতি, বিজ্ঞান, অধ্যবসায়, বিষয়জ্ঞান এ সকল পুরুষের গুণ অর্থাৎ এ সকলই পুরুষে অধিষ্ঠিত।

দেখা যাইতেছে আয়ুর্বিজ্ঞান যাহার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে সেই পুরুষ—শরীর, আত্মা ও মন এই তিনকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্বভাবতঃই এই তিনের যাহা ক্রিয়া তাহাও একযোগেই সম্পন্ন হয় এই পুরুষের মধ্য দিয়া। চিকিৎসা করিতে হইলে এই তিনের সমন্বয়ে যে পুরুষ তাহার সম্বন্ধে সবটুকু জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। একদেশদর্শী বিদ্যা হইলে চিকিৎস্য পুরুষের সবটুকুকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না।

সেইজন্য পুরুষের শরীর এবং শরীরে আশ্রিত ইন্দ্রিয়সকল, বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতি দোষসকল, শরীরের ধাতু, কলা, মর্ম, শিরা, কণ্ডরা প্রভৃতিকে যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা প্রয়োজন তেমনিই জানা প্রয়োজন পুরুষের

মনকে এবং মনের যাহা কাজ অর্থাৎ বিচার, বুদ্ধি, চিন্তা, ইন্দ্রিয়াদির কাজ, বিষয়, উপকরণ প্রভৃতিকে এবং মনের চেষ্টা, ব্যক্তিত্ব, স্মৃতি, প্রত্যয়, সংকল্প, অহঙ্কার প্রভৃতিকে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—

মানুষের প্রকৃতি অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণ দ্বারা জানা যায়। তাহার শরীর ও মনের লক্ষণ মিলাইয়া কে কোন প্রকৃতির পুরুষ তাহা নির্ণয় করিতে হয়। এবং এইভাবে পুরুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলে সর্বাঙ্গসুন্দর চিকিৎসা সম্ভব।

কায়ানাং প্রকৃতীর্জ্ঞাত্বা ত্বনুরূপাংক্রিয়াং চরেৎ।
মহাপ্রকৃতয়স্ত্বেতা রজঃ সত্ত্ব তমঃ কৃতাঃ
প্রোক্তা লক্ষণতঃ সম্যগ্ ভিষক্ তাশ্চ বিভাবয়েৎ ।।

(সুশ্রুত সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়—শারীরস্থান, শ্লোক ৬০)

আয়ুর্বেদাচার্যগণের মতে মানুষের শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান দুইয়েরই পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান থাকা দরকার।

বর্তমান কালে মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক শাস্ত্র। মনোবিদ্যার ছাত্রগণ তাহা পড়িয়া থাকে। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্রগণ একমাত্র মানসিক ব্যাধিগুলি পড়িবার সময় ছাড়া মনোবিদ্যা পড়ে না। উন্মাদ রোগের প্রকারভেদ বা অন্যান্য মনোবিকার পড়িতে হইলে মনোবিদ্যা কিছু কিছু জানিতে হয়। সেজন্য মন সম্বন্ধে কিছু পল্লবগ্রাহী বিদ্যা ছাড়া মনোবিদ্যা সম্বন্ধে সর্বাঙ্গসুন্দর ধারণা এই ছাত্রগণের জন্মে না। মানসিক রোগ ছাড়াও শারীর রোগের অনেকগুলিই যে মনোবিকারের ফলে উৎপন্ন হয় অথবা উৎপন্ন না হইলেও মনের প্রভাবে ঐ সব রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় এ সত্য আজ আধুনিক বিজ্ঞানে স্বীকৃত।

এতটা জানা সত্ত্বেও দেহের অধিষ্ঠানে যে মন সর্বদাই ক্রিয়াশীল তাহার সম্বন্ধে ভালভাবে আলোচনার ব্যবস্থা নাই। কাজেই পূর্ণাঙ্গ মানব সম্বন্ধীয় ধারণা ছাত্রের অসম্পূর্ণ থাকে।

আয়ুর্বেদচার্যগণ এ বিষয়ে কেবল নিজেরাই যে সম্যক্ অবহিত ছিলেন তাহা নহে, শিষ্যপরম্পরায় এই বিদ্যা যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

আয়ুর্বেদে মনোদর্শন পৃথক ভাবে কোন অধ্যায়ে বর্ণিত হয় নাই। সমস্ত

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া আছে। যে কোনও অধ্যায় পড়াইবার সময় অধ্যাপকগণ প্রয়োজনমত এবং প্রাসঙ্গিক ভাবে মনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

শুধু তত্ত্বগত বিশ্লেষণেই তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তত্ত্বের সহিত প্রয়োগগত দিককে আরও বিশেষভাবে আয়ত্ত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে শুধু তত্ত্ব জানিয়া লাভ নাই, তাহার ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান প্রয়োজন।

সুশ্রুত বলেন—

যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ কর্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ
স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য প্রাপ্যভীরুরিবাহবম্।

(সূত্রস্থান—তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ১৫)

যে চিকিৎসক শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রের তত্ত্বই জানিয়াছেন, তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ শেখেন নাই, সেই চিকিৎসক কর্মক্ষেত্রে আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগত ভীরুর দশাপ্রাপ্ত হন।

এই সমস্ত কারণেই মনের সুস্থতা সম্বন্ধে তত্ত্বগত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই মনের অসুস্থতার কারণ এবং প্রতিকারের উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। মনের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গ আলোচনাকালে সংহিতাকারগণ তাঁহাদের ধারণা অনুযায়ী গর্ভস্থ শিশুর মনের বিকাশ সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন এবং মাতার উপর তাহার প্রভাবও বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্যই সমস্ত তন্ত্রগুলিতেই এই মনোদর্শন ব্যাপক আকারে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে।

আমি সমস্ত তন্ত্র হইতে মন সম্বন্ধীয় সমগ্র চিন্তাধারা সংগ্রহ করিয়া তাহার বিশ্লেষণ ও বিচারপূর্বক গ্রন্থনার চেষ্টা করিয়াছি।

এই চেষ্টায় আমি পৃথক পৃথক সংজ্ঞা দিয়া অধ্যায় বিন্যাস করিয়াছি, যাহাতে এক একটি দৃষ্টিকোণ হইতে মন সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা যায়। সমস্ত অধ্যায়েই তত্ত্বগত আলোচনার পর অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রয়োগগত আলোচনাও রাখা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রারম্ভিক সূত্র

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে মনোবিদ্যা বা মন সংক্রান্ত দর্শনের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদাচার্যগণ ও সংহিতাকারগণের চিন্তাধারা এবং তাঁহাদের শারীর-বিশ্লেষণের মূল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। সমগ্র আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলির আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমরা সব কিছুরই মধ্যে তিনটি মূল সূত্রের সন্ধান পাই এবং ঐ মূল সূত্র তিনটিকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র আয়ুর্বেদের পঠনপাঠন আবর্তিত হইয়াছে। মূল প্রসঙ্গ আরম্ভে আমি সেই মূল সূত্র তিনটির আলোচনা করিব। কারণ মনোদর্শনের তত্ত্বগত ক্ষেত্রই হউক বা ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রই হউক, ঐ সূত্র তিনটির কোনটিই আমরা বর্জন করিতে পারি না। এই সূত্রগুলি মনের পশ্চাৎপটে রাখিলে আমরা মনোদর্শনের অনেকগুলি আপাতজটিল তত্ত্বের সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইব। আবার ঐ সূত্রগুলি মনে না রাখিলে অনেক বিষয়েরই ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দিশাহারা হইতে হইবে।

প্রথম সূত্র ঃ আয়ুর্বেদ প্রবক্তাগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের অঙ্গ।

আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের অঙ্গ

ভিন্ন ভিন্ন সংহিতাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র প্রণয়ন করিলেও মূল নিয়মকে কেহই অতিক্রম করেন নাই। ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের আচার্যগণ শল্য ও শালাক্যতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক হইলেও অথবা আত্রেয় সম্প্রদায় শল্য ও শালাক্যতন্ত্র গ্রহণ না করিলেও তাঁহাদের সকলেরই একই বক্তব্য যে, এই শাস্ত্রের সকল শাখাই একই বেদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাঁহাদের চিন্তাধারা কখনও বেদ-বহির্ভূত পথ অবলম্বন করে নাই।

সুশ্রুত (ধন্বন্তরি সম্প্রদায়) বলিয়াছেন—

ইহ খল্বায়ুর্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব
প্রজাঃ শ্লোক-শত-সহস্রমধ্যায়-সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ

(সুশ্রুত সংহিতা. প্রথম অধ্যায়—সূত্রস্থান, শ্লোক ৫)

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়া তাহাকে সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া এই আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সংহিতাকারগণ নিজেদের শিক্ষা ও পারদর্শিতা অনুযায়ী তাহার অংশবিশেষ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সুশ্রুত-সংহিতার টীকাকার শ্রীডল্লন বলেন আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের উপাঙ্গ। সমগ্র অথর্ববেদই আয়ুর্বেদ নহে।

উপাঙ্গম্ অল্পমেবাল্পত্বাৎ উপাঙ্গম্। তদ্ যথা দেহস্য
বাহুজঙ্ঘেশিরঃ ইত্যঙ্গানি করচরণনাসিকাদীনি উপাঙ্গানি।

(শ্রীডল্লন বিরচিত নিবন্ধ সংগ্রহ)

যেমন মানুষের বাহু-জঙ্ঘা-শির ইত্যাদি অঙ্গ আর হাত-পা-নাক প্রভৃতি উপাঙ্গ, তেমনই আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের উপাঙ্গ। কেহ কেহ বলেন অঙ্গের অত্যন্ত নিকটে থাকে বলিয়া ইহাদের নাম উপাঙ্গ।

এতেন উপাঙ্গমিত্যুক্তং উপাঙ্গমঙ্গসমীপমিত্যোকে।

কাজেই উপাঙ্গগুলিও মূল অঙ্গের সমীপেই থাকে। এই কারণেই আয়ুর্বেদের বিভিন্ন তন্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্যগণ যতই আলোচনা করুন না কেন

ধন্বন্তরি সম্প্রদায় তাহার বেদমূলত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই কারণেই ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের আচার্যগণ যথা সুশ্রুত, ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য, গোপুর, রক্ষিত সকলেই শল্য শালাক্যতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চিকিৎসাকার্য করিলেও আত্রেয়, ভরদ্বাজ, অগ্নিবেশ প্রভৃতি আচার্যগণের সহিত একমত ছিলেন যে, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা লক্ষশ্লোক দ্বারা পূর্ণ সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত এই আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানায়ুর্বেদং শতক্রতুঃ।
পদৈরল্পৈর্মতিং বুদ্ধ্বা বিপুলাং পরমর্ষয়ে।
হেতুলিঙ্গৌষধজ্ঞানং স্বস্থাতুর-পরায়ণম্।
ত্রি সূত্রং শাশ্বতং পুণ্যং বুবুধে যং পিতামহঃ॥

(চরক সংহিতা. সূত্রস্থানম্—শ্লোক ২)

প্রারম্ভিক সূত্রের প্রথম সূত্র হিসাবে আমি আচার্যগণের এই ধারণাগুলি বিশেষ কারণেই উল্লেখ করিতেছি। প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা চর্চা বা মানুষের জীবনযাত্রা প্রক্রিয়া সবই অধ্যাত্মবোধের সহিত অঙ্গাঙ্গী-ভাবেই জড়িত ছিল। আয়ুর্বেদের প্রবক্তাগণও তাহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। বিশেষতঃ বেদের অংশ হিসাবে আয়ুর্বেদকে চিন্তা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র যথা শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসাতন্ত্র, ভূতবিদ্যাতন্ত্র, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র রচনাকালে তাঁহারা যেমন অধ্যাত্মবোধের মূল সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই—তেমনই শল্য-শালাক্যতন্ত্র বাদ দিয়া যাঁহারা সংহিতা রচনা করিয়াছেন, যথাঃ সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসিতস্থান, কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান—সেই ভরদ্বাজ, আত্রেয় অগ্নিবেশ প্রভৃতি আচার্যগণও একই চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের শিক্ষা শিষ্যগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। কার্যতঃ বেদের আলোচনায় যে অধ্যাত্মবোধের বিকাশ এবং পরিপুষ্টি ঘটিত আয়ুর্বেদ শিক্ষা এবং প্রয়োগেও সেই বোধই শিক্ষক, ছাত্র এবং শিক্ষান্তে যাঁহারা চিকিৎসক-রূপে সমাজে আত্মপ্রকাশ করিতেন, সকলকেই চালিত করিত। সেইজন্যই যাগযজ্ঞ, মন্ত্রপ্রয়োগ প্রভৃতি ক্রিয়া চিকিৎসার অঙ্গরূপে গণিত হইয়াছে। ঔষধ প্রয়োগের পাশাপাশি মাঙ্গলিক ক্রিয়াসকলেরও স্থান হইয়াছে।

ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের চিকিৎসা গ্রন্থ বিভাগ

ভরদ্বাজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বিভাগ

সুশ্রুত সংহিতায় ব্রণাক্রান্ত রোগীর ব্রণচ্ছেদনের পর যথাযথভাবে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ও বন্ধনাদি করিয়া পরে রক্ষামন্ত্র পাঠের বিধি আছে। যথা—

কৃত্যানাং প্রতিঘাতার্থং তথা রক্ষোভয়স্য চ

রক্ষা কর্ম করিষ্যামি ব্রহ্মা তদনুমন্যতাং।...ইত্যাদি

(সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থানম্—অগ্রোপহরণীয় অধ্যায়, শ্লোক ১৪)

ব্রণ রোগী কি ভাবে থাকিবে, কি করিবে—এসব বিষয়ে উপদেশে বলা হইয়াছে—

সদা নীচ-নখ-রোম্না শুচিনা শুক্ল-বাসসা শান্তি-মঙ্গল-দেবতা

ব্রাহ্মণ-গুরুপরেণ ভবিতব্যমিতি। তৎ কস্য হেতোর্হিংসা বিহারাণি

হি মহাবীর্যাণিরক্ষাংসি, পশুপতি কুবের কুমারানুচরাণি মাংসশোণিত প্রিয়ত্বাৎ ক্ষতজ-নিমিত্তং ব্রণিনমুসর্পন্তি সৎকারার্থং জিঘাংসুনি বা কদাচিৎ ॥

(সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থানম্—ব্রণিতোপাসনীয় অধ্যায়, শ্লোক ৭)

মহাবীর্যসম্পন্ন ও হিংসাপ্রিয় রাক্ষসগণ এবং পশুপতি, কুমার ও কুবেরের অনুচরগণ রক্তমাংসের লোভে রোগীকে আক্রমণ করিতে পারে। সুতরাং উহাদের নিকট হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য ব্রণ রোগী নখ ও লোম কাটিয়া সাদা কাপড় পরিয়া শান্তি ও মঙ্গলের দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরুকে ভক্তি-ভরে স্মরণপূর্ব্বক পবিত্রভাবে বাস করিবে। অশুচিভাবে থাকিবে না। সন্ধ্যাকালে ব্রণ রক্ষার জন্য উপাধ্যায় এবং চিকিৎসক নিজে সাম, যজু এবং অথর্ববেদোক্ত শান্তি ও হিতকর আশীর্ব্বাদের মন্ত্রসকল পাঠ করিয়া ব্রণ রক্ষা করিবেন।

ঋগ্‌যজুঃসমাথর্ববেদাভি হি তৈরপরৈশ্চাশীর্বিধানৈরুপাধ্যায়া ভিষজশ্চ সন্ধ্যয়ো রক্ষাং কুর্যুঃ।

(ঐ—শ্লোক ৮)

প্রশ্ন উঠিতে পারে প্রথম সূত্রের এতটা ব্যাপক আলোচনা এই গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক কিনা। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যে সমস্ত আলোচনা করিয়াছি তাহার তত্ত্বগত দিক ছাড়াও ব্যবহারিক দিকের আলোচনার সময় পুনঃ পুনঃ এই প্রথম সূত্রোক্ত ধ্যান-ধারণার সাক্ষাৎ মিলিবে। প্রথম সূত্রোক্ত এই মানসিকতার সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় না থাকিলে আলোচনায় এবং ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইতে পারে এবং চিন্তার পথে আচার্যগণ বহুবিষয়ের যে সমাধান করিয়াছেন সেই সমাধানের অর্থও হয়ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

দ্বিতীয় সূত্র :

এইবার দ্বিতীয় সূত্রের আলোচনা করিব। কি সুস্থ কি অসুস্থ সব অবস্থাতেই মানুষের দেহ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষের সমন্বয়ে গঠিত। ইহাই হইল আয়ুর্বেদকারগণের মত। সুশ্রুত বলেন— বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটিই দেহ উৎপত্তির কারণ বলিয়া মনে করা হয়। অবিকৃত অবস্থায় এই তিনটি দেহের অধঃ মধ্য ঊর্দ্ধ্বদেশে থাকিয়া তিনটি স্তম্ভের মত শরীরকে ধারণ করিয়া আছে। সেই জন্য কেহ কেহ এই শরীরকে ত্রিস্থূণ (স্তম্ভ)

আগার বলিয়াও অভিহিত করেন। এই বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা থাকিলে এবং বিকৃতি না হইলে দেহ সুস্থ থাকে। এইগুলির অসাম্য আসিলে বা বিকৃতি হইলে রোগ হয়। যে কোনও রোগ হউক না কেন বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকৃতির ফলেই হয়—এই হইল সকল আয়ুর্বেদাচার্যগণের অভিমত।

বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ।
তৈরেবা ব্যাপন্নৈরধোমধ্যোর্দ্ধ্ব সন্নিবিষ্টৈঃ
শরীরমিদং ধার্য্যতেঽগারমিব
স্থূণাভিস্তিসৃভিরতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে।

[সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থান—২১শ অধ্যায়, শ্লোক ১]

ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃশাখং ত্রিস্থূণং পঞ্চদৈবতম্
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বৈ বেদ স বেদবিৎ।

[শ্রীডল্লন বিরচিত নিবন্ধ সংগ্রহ]

বায়ু, পিত্ত, কফ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ না করিলে আয়ুর্বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এই বায়ু, পিত্ত, কফ কিন্তু সাধারণ অর্থে যাহাকে বায়ু, পিত্ত, কফ বলিয়া ভাবা হয় বা সর্বসাধারণের মনে যে ধারণা আছে তাহা নয়। গতিসূচক বা গন্ধ প্রকাশার্থক 'বা' ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়া বাত শব্দ হয়। সংতাপার্থক 'তপ' ধাতুর উত্তর ইচ প্রত্যয়ে পিত্ত শব্দ এবং 'শ্লিষ্' ধাতুর (আলিঙ্গনার্থে) উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া শ্লেষ্মা শব্দ হয়। কফ শ্লেষ্মার প্রতিশব্দ।

বায়ু, পিত্ত, কফ প্রত্যেকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া শরীর রক্ষা করে।

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্যানিলা যথা
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলা স্তথা।

[সুশ্রুত সংহিতা, ২১শ অধ্যায়, শ্লোক ৫]

যেমন চন্দ্র নিজের শীতল কিরণ জগৎকে দেয়, সূর্য নিজের উষ্ণ রশ্মি দ্বারা ঐ শীতল ভাব আকর্ষণ করিয়া আবার জগৎকে উষ্ণতা দেয় আর বায়ু উভয়কে চালনা করিয়া উষ্ণতা ও শীতলতার সাম্য রক্ষা করিয়া জগৎকে বাঁচাইয়া রাখে তেমনিই কফ শরীরকে আর্দ্র করে, পিত্ত উষ্ণতা দ্বারা শুষ্ক

করে এবং বায়ু গতিপ্রবাহ দ্বারা শীতলতা এবং উষ্ণতার ভারসাম্য রক্ষা করিয়া দেহকে রক্ষা করে। বাগ্‌ভট বলেন—

বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি ত্রয়ো দোষাঃ সমাসতঃ।
বিকৃতাঽবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তি তে বর্তয়ন্তি চ॥

[অষ্টাঙ্গ হৃদয়, সূত্র স্থানম্—প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ৭]

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—

বায়ু, পিত্ত, কফের এই সূত্র সম্বন্ধে পিতামহ ব্রহ্মা অবগত ছিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত সেই ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্বেদ মহর্ষি ভরদ্বাজ তন্মনা হইয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বায়ু, পিত্ত, কফের মূল অর্থ এবং শরীরে সুস্থতায় বা অসুস্থতায় ইহাদের অবস্থিতি, ক্রিয়া প্রভৃতি না জানিলে আয়ুর্বেদের কোনও জ্ঞান জন্মানই সম্ভব নয়। মনোদর্শনেও এই বায়ু, পিত্ত, কফের বিষয় বারবার উল্লেখ করা হইবে। সেইজন্যই প্রারম্ভিক সূত্রে এই জ্ঞানকেই দ্বিতীয় সূত্র বলিতেছি।

(আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বায়ু, পিত্ত, কফের ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। সমস্ত শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গণের afferent এবং efferent neurones, sensory এবং motor nerves এবং autonomic nervous system-এর nerve impulse-কেই বায়ু বলা যায়। এই হিসাবেই বায়ুর ব্যাপকতা বোঝা যায়।

পিত্ত—সমস্ত শরীরে calorie সৃষ্টিকারী ব্যাপক প্রক্রিয়াকে পিত্তের ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। calorie সৃষ্টি করিতে হইলে ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ করিবার ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পরিণতি metabolism পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াকেই পিত্তের ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

পাকাশয় প্রভৃতিতে যে সমস্ত জারক রস বা enzyme নিঃসারিত হয় এবং যে ভাবে খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হয়, পরে রক্তের দ্বারা বাহিত হইয়া সমস্ত শরীরে calorie সৃষ্টি করে—সবই পিত্তের অধিকারে।

শ্লেষ্মা—শরীরের সমস্ত স্নিগ্ধকারী রসই শ্লেষ্মার অন্তর্ভুক্ত। মেদ-লসিকা অস্থি-সন্ধি সকলের ভিতরে যে রস নিঃসৃত হইয়া মসৃণতা উৎপাদন করে, শরীরের যাবতীয় স্নেহ পদার্থ (lipoids) যাহা মস্তিষ্ককেও পুষ্ট করে এমনই সব পোষণকারী রসকেই শ্লেষ্মার পর্যায়ে ফেলা যায়।)

এই দ্বিতীয় সূত্রের ধারণাও মনোদর্শনকে বুঝিতে সাহায্য করিবে।

বিশেষতঃ ব্যক্তিত্ব, স্বপ্নদর্শন এবং মানসিক ব্যাধি অধ্যায়ে জ্ঞানলাভের জন্য দ্বিতীয় সূত্র অপরিহার্য। মনের অধিষ্ঠান অধ্যায়ে বায়ুর এই ক্রিয়াগুলির কথা আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় সূত্র ঃ

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—

বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।
মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ।

(চরক সংহিতা, সূত্রস্থান—প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ৩০)

বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি হইল শরীরের দোষ। প্রকৃতপক্ষে যাহারা শরীরের ধারক এবং ক্রিয়ার উৎস তাহাকে দোষ বলা হয় কেন? দোষ এই জন্যেই বলা হয়, ইহারা কুপিত হইলে শরীরে রোগ উৎপন্ন হয়। আয়ুর্বেদ-কারগণ এই অর্থেই ত্রিদোষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাহা হউক শরীরের যেমন দোষ আছে মনেরও তেমনই দোষ আছে। মনের দোষ দুইটি রজ ও তম। সত্ত্ব কখনও বিকৃত হয় না। কাজেই সত্ত্বগুণকে কখনও দোষ-রূপে বলা হয় না।

বাগ্‌ভট বলেন—

তেষাং কায়মনোভেদাদধিষ্ঠানমপি দ্বিধা।
রজস্তমশ্চ মনসো দ্বৌ চ দোষাবুদাহৃতৌ।

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়-সূত্র স্থান, প্রথম অধ্যায়—শ্লোক ২০)

সত্ত্ব, রজ ও তম তিনটির সুষম অবস্থায় মনের পুষ্টি ও সুস্থতা লাভ হয়। কিন্তু রজ ও তম এই দুই দোষের অসাম্যে মনের ব্যাধি হয়।

আত্রেয় বলেন—

প্রশাম্যত্যৌষধৈঃ পূর্বো দৈবযুক্তি ব্যপাশ্রয়ৈঃ
মানসো জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধৈর্য-স্মৃতি-সমাধিভিঃ।

(চরক সংহিতা, ঐ—শ্লোক ৩১)

শরীরের রোগ যেমন যুক্তিপূর্ণ ঔষধ এবং যথাযথ দৈবক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, মনের রোগ জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য, স্মৃতি ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসিত হয়।

প্রারম্ভিক সূত্রে তিনটি সূত্রের উল্লেখ শেষে এবার মনোদর্শনের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইব।

তৃতীয় অধ্যায়

মনের সংজ্ঞা

মন কি ? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মনকে বোঝা যায় না। মনকে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করা যায় না, কানে শোনা যায় না। কিন্তু মনকে আমরা জানিতে পারি। মন যে বর্তমান তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের কার্য-নির্বাহ করে। ইহার অর্থ এই যে আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের অনুভূতি এবং তজ্জনিত প্রতিক্রিয়াসকল মনের সংযোগ ভিন্ন সম্পন্ন হয় না।

ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যাহাকে বোঝা যায় না, আবার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যনির্বাহে এবং চিন্তা অনুভূতি স্মৃতি বিচার প্রভৃতি যাহা দ্বারা নির্বাহ হয় তাহাকেই 'মন' এই সংজ্ঞা দেওয়া যায়। সেই জন্যই মন অতীন্দ্রিয়।

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—

অতীন্দ্রিয়ং পুনর্মনঃ।
সত্ত্বসংজ্ঞকং চেত্যাহুরেকে
তদর্থাত্মসম্পদায়ত্তচেষ্টম্
চেষ্টা প্রত্যয়ভূতমিন্দ্রিয়াণাম্ ।।

(চরক সংহিতা—সূত্র স্থানম্, ৮ম অধ্যায়, ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়, শ্লোক ২)

অনেকেই মনকে অতীন্দ্রিয় বলেন—কেহ কেহ বলেন ইহা সত্ত্ব। আত্মার যে সকল সম্পদ, যেমন অনুভূতি, ইচ্ছা, বিচার, চিন্তা, অন্যান্য চেষ্টাসকল এবং ইন্দ্রিয়গণের যে যে ক্রিয়া হইতে পারে যেমন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন ইত্যাদি এবং তাহার প্রতিবর্ত হিসাবে যে সকল ক্রিয়া যেমন ইন্দ্রিয়সুখভোগের ইচ্ছা উৎপাদন অথবা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি—এই সবই মনের ক্রিয়া বলা যায়। এই

জন্যই বলা হইয়াছে চেষ্টা 'প্রত্যয়ভূতমিন্দ্রিয়াণাম'। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রিয়গণ এবং তাহাদের ভোগ্য বিষয়, অর্থ প্রভৃতি আলোচনা করা যাক্। এই আলোচনায় ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনের সম্পর্ক ভালভাবে উপলব্ধি করা যাইবে। আচার্যগণ বলেন—মন, বুদ্ধি ও আত্মা ইহারা একযোগে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া এবং বোধের হেতুস্বরূপ। মন জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় উভয়ের গুণবিশিষ্ট। সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য মনের প্রভাবেই সম্পন্ন হয়।

ইন্দ্রিয় পাঁচটি ; ইন্দ্রিয়ের উপকরণ পাঁচটি ; ইন্দ্রিয়ের বিষয় পাঁচটি ; ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধি পাঁচটি এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান পাঁচটি।

ইন্দ্রিয় পাঁচটি—তত্র চক্ষুঃ শ্রোত্রং ঘ্রাণং রসনং স্পর্শনমিতি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি—
দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শন।

ইন্দ্রিয়ের উপকরণ—পঞ্চেন্দ্রিয় দ্রব্যাণি খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূরিতি —
আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও ক্ষিতি।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান—পঞ্চেন্দ্রিয়াণি অধিষ্ঠানানি অক্ষিণী কর্ণে নাসিকে জিহ্বা ত্বক্ চেতি—
চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, জিহ্বা ও ত্বক।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়—পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাঃ—
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের বুদ্ধি বা বোধ—পঞ্চেন্দ্রিয়বুদ্ধয়শ্চক্ষুর্বুদ্ধ্যাদিকাঃ—
দর্শনবোধ, শ্রবণবোধ, ঘ্রাণবোধ, স্বাদবোধ, স্পর্শবোধ।

[চরক সংহিতা—সূত্রস্থান, ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়, শ্লোক ৪]

এই সকল ইন্দ্রিয়ের যে সমস্ত ভোগ্য এবং উপকরণ বর্ণিত হইল সকলই ইন্দ্রিয় বোধের সৃষ্টি করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বোধ সৃষ্টি করাই সকল উপকরণ প্রভৃতির উদ্দেশ্য। এই ইন্দ্রিয়বোধসৃষ্টি কিন্তু মননিরপেক্ষ হইতে পারে না। প্রতিটি জ্ঞানেন্দ্রিয় নিজ নিজ উপকরণ হইতে মনের সাহায্যে বোধ জন্মাইয়া থাকে এবং বোধের ফলস্বরূপ প্রতিবর্ত ক্রিয়া হিসাবে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়কে (যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) কার্যে প্রবৃত্ত করে। ইন্দ্রিয়সকলের বহির্জগৎ হইতে উত্তেজনা গ্রহণ এবং আন্তর জগৎ হইতে কর্মেন্দ্রিয়ে প্রেরণা সৃষ্টি সবই মনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

আত্রেয় বলেন—

পুনরিন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থ সত্ত্বাত্ম সন্নিকর্ষজাঃ

[চরক সংহিতা—ঐ]

ইন্দ্রিয়ার্থ—ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা একযোগে কাজ করিলে ইন্দ্রিয়গণের বোধের উদয় হয়। তাহা হইলে একথা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়সকলের দৃশ্য বা অদৃশ্য সকল প্রকার ক্রিয়ার কারণ স্বরূপ এই মন।

মনের অস্তিত্বের প্রমাণ ঃ

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—

লক্ষণং মনসো জ্ঞানস্যাভাবো ভাব এব বা।
সতি হ্যাত্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সন্নিকর্ষেণ বর্ততে ॥
বৈধৃত্যান্মনসো জ্ঞানং সান্নিধ্যাৎ তচ্চ বর্ততে।
অণুত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌ গুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ ॥
চিন্ত্যং বিচার্য্যমূহ্যঞ্চ ধ্যেয়ং সংকল্প্যমেব চ।
যৎ কিঞ্চিন্মনসো জ্ঞেয়ং তৎ সর্ব হ্যর্থসংজ্ঞকম্ ॥
ইন্দ্রিয়াভিগ্রহঃ কর্ম মনসস্বস্য নিগ্রহঃ।
ঊহো বিচারশ্চ ততঃ পরং বুদ্ধি প্রবর্ততে ॥
ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থো হি সমনস্কেন গৃহ্যতে।
কল্প্যতে মনসাপ্যূর্দ্ধং গুণতো দোষতো যথা ॥
জায়তে বিষয়ে তত্র যা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা।
ব্যবস্যতে তথা বক্তুং কর্তুং বা বুদ্ধিপূর্বকম্ ॥

[চরক সংহিতা, শারীর স্থান, কতিধাপুরুষীয়ম্ অধ্যায়—১ম অধ্যায়, শ্লোক ৭।৮]

জ্ঞানের উপস্থিতি অথবা অভাবের দ্বারা মনের অস্তিত্ব বোঝা যায়। প্রকারান্তরে বলা যায় জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিলেই মনেরও অস্তিত্ব আছে। যদি আত্মা, ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য উপকরণসকল একত্রিতও হয় তথাপি মন যতক্ষণ ইহাদের সহিত সংযুক্ত না হয় ততক্ষণ ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়বোধ সম্পূর্ণ হয় না। একজন অচেতন লোকের মুখে মিষ্ট স্বাদযুক্ত পদার্থ দিলেও সে স্বাদ অনুভব করিতে পারে না। তাহার আত্মা আছে—ইন্দ্রিয়ও আছে ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুও আছে, অথচ মন যেহেতু অনুপস্থিত, সে হেতু স্বাদ অনুভব হয় না। এই প্রমাণের উপরেই ধারণা করা যায়—মনের একটি পৃথক সত্তা আছে এবং ইহা নিশ্চিত। মনের সত্তা থাকিলেই তাহার এমন কিছু গুণ অবশ্যই থাকিবে যাহা তাহার নিজস্ব কিছু ভোগ্য বিষয়ও

থাকিবে এবং কিছু কর্মও থাকিবে যাহা অন্যের মধ্যে নাই। এইগুলি কি তাহাই আলোচনা করা যাক।

মনের দুই গুণ ঃ

অণুত্ব ও একত্ব—মনের এই দুই গুণ। অণুত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব—মন অপেক্ষা সূক্ষ্ম আর কিছুই নাই। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন অতি সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বোধ সৃষ্টি করে। মনই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সর্বত্র ভাব সৃষ্টি করিতে পারে।

একত্ব মনের আর একটি গুণ। একত্ব অর্থাৎ অসংশ্লিষ্টত্ব অর্থাৎ মন কখনও একই সময়ে বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করে না। বাহ্যতঃ পৃথক পৃথক ক্রিয়া চালনা করিলেও সেই পৃথক ক্রিয়ার ফল সেই মুহূর্তে মনের দিক দিয়া একটিই হয়। যেমন নাটক-দর্শন। একই সঙ্গে মন দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় চালনা করিতেছে। দুই ইন্দ্রিয়ের দুই ক্রিয়ার যোগফল কিন্তু একই অর্থাৎ নাটকের পূর্ণাঙ্গ রসোপলব্ধি। কাজেই মনের অসংশ্লিষ্টত্ব একটি বিশিষ্ট গুণ।

মনের অর্থ বা ভোগ্য বিষয় ঃ

মনের অর্থ বা ভোগ্য বিষয় এইগুলি—যে কোনও চিন্তাযোগ্য বিষয়, বিচার্য বিষয়, তর্কযোগ্য বিষয়, ধ্যেয় বা গভীর চিন্তা দ্বারা ধ্যানযোগ্য বিষয় এবং সংকল্পযোগ্য বিষয় এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ যাহা কিছু জানিবার যোগ্য বিষয়। ইহারই মধ্যে কাহাকেও না কাহাকেও আশ্রয় করিয়া মনের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। এই বিষয়গুলির মধ্য দিয়া আর কাহারও ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। মনের স্বতন্ত্র সত্তার প্রমাণ হিসাবে ইহাও উল্লেখযোগ্য।

মনের কর্ম দুইটি ঃ

ইন্দ্রিয়গণকে চালনা এবং নিজেকে চালনা। যদিও শুনিতে অদ্ভুত বোধ হয় তবুও মন নিজেকে চালনা না করিলে তাহাকে কে চালনা করিবে? এই দুইটি চালনা হইতে তর্ক ও বিচার উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়গুলি মন নিজের ক্রিয়া দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ করাইয়া থাকে। ঐ সব ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া দোষযুক্তও হইতে পারে, আবার গুণযুক্তও হইতে পারে। দোষযুক্তই হউক বা গুণযুক্তই হউক, মন নিজের ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাহার ক্রিয়া উভয়ের মধ্যে তর্ক ও বিচার করিয়া একটা নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করে এবং

সেই নিশ্চয়তা অর্থাৎ এই কাজ করা হইবে বা এই কথা বলা হইবে, এই সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক মত সৃষ্টি করে। মতের এই নিশ্চয়াত্মক পরিণতিই বুদ্ধি। এই বুদ্ধির প্রভাবেই মনের চূড়ান্ত কাজের সমাধা হয়। সমগ্র ব্যাপার কিন্তু সময় সাপেক্ষ নহে—প্রতি মুহূর্তেই ইন্দ্রিয়াদির মধ্য দিয়া মনের এই বুদ্ধির প্রকাশ ঘটিতেছে।

মন যে নিজেকে নিজে চালিত করে এ সম্বন্ধে তর্কও আছে। আত্রেয়ের শিষ্যদের মধ্যে প্রশ্ন উঠিয়াছে—তবে কি মনই কর্তা? কিন্তু আত্মা তাহা হইলে কি?

তাঁহারা বলিয়াছেন—

অচেতনং ক্রিয়াবচ্চ মনশ্চেতয়িতা পরঃ।
যুক্তস্য মনসা তস্য নির্দিশ্যন্তে বিভোঃ ক্রিয়াঃ ॥
চেতনবান্ যতশ্চাত্মা ততঃ কর্তা নিরুচ্যতে।
অচেতনত্বাচ্চ মনঃ ক্রিয়াবদপি নোচ্যতে ॥

[চরক সংহিতা শারীর স্থান ১ম অধ্যায়—শ্লোক ৩৩]

মন স্বয়ং অচেতন। স্বভাবতঃ অচেতন মনের চেতয়িতা হইতেছে আত্মা। তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে কর্তা কে? যেহেতু আত্মাই চেতয়িতা তাহা হইলে কর্তা নিশ্চয়ই আত্মা। মন যদি আত্মার দ্বারা চেতনাপ্রাপ্ত না হয় তবে মন নিষ্ক্রিয় থাকে। আত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত দেহে মন ক্রিয়াশীল। তখন

আত্মার কর্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন

মনের যে সব কাজ সম্পাদিত হয় তাহা মনের কাজ বলিয়া ধারণা হইলেও মনকে জীবন সঞ্চার করিয়া ক্রিয়াশীল করে আত্মাই। আত্মার সহিত যুক্ত না হইলে যেহেতু মনের কর্মক্ষমতা থাকে না সেহেতু আত্মাকেই কর্তা বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে আত্মা এমন একটি শক্তি যাহার অভাবে দেহী মৃত বলিয়া গণ্য হয়। মৃতদেহে মন ইন্দ্রিয় সবই মৃত। শুধু এই

বিচারে মনের কর্তৃত্বের প্রমাণ

বিচারের উপর মনের কর্তৃত্ব খণ্ডিত হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে—আত্মা, ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য উপকরণ যুক্ত হইলেও মন যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ইন্দ্রিয়বোধের উদয় হয় না। অতএব দেহীর জীবনবোধের কর্তা আত্মা হইলেও পূর্বোক্ত সকল ক্রিয়ার কর্তা মনই।

অহংবোধ বা অহংকার:

মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—যে বুদ্ধিবলে মানুষ ভাবিতে পারে যে

আমিই জাতি, রূপ, বুদ্ধি, স্বভাব, বিদ্যা, কুল, যৌবন, বীর্য ও প্রভাবের নিয়ন্তা বা আমার কার্যের ফলেই এই সকল আমাতে অর্শাইয়াছে এই প্রকারের বুদ্ধিকেই অহংকার বলে।

তত্রৈবং জাতিরূপ-বিত্ত-বুদ্ধি-শীল-বিদ্যাভি-
জন-বয়োবীর্য-প্রভাব-সম্পন্নোঽহমিত্যহঙ্কারঃ।

[চরক সংহিতা. শারীর স্থান পুরুষ বিচয় অধ্যায়, ৫ম অধ্যায়—শ্লোক ১২]

এই অহংবোধ মনের তথা ইন্দ্রিয়ের বোধ জাগ্রত করে। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার মধ্য দিয়াই মনের অহংবোধ চরিতার্থ হয়। সেইজন্য সুশ্রুত অহংকারকে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তির কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সচেতন অহংকার বিশিষ্ট জীবকে সুশ্রুত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বলিয়াছেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ তাহার কার্যাদি সম্বন্ধে সচেতন। "আমি দেখি—আমি শুনি" এমনই সব ইন্দ্রিয়ের সকল ক্রিয়া সম্বন্ধে সে সচেতন এবং অহংকারই

অহঙ্কার

তাহাকে এই সচেতনতা দেয়। সুশ্রুতের মতে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিই চেতনাবিশিষ্ট এবং অহংকার-যুক্ত জীবসমূহের আশ্রয়। ঐ প্রকৃতি হইতেই সত্ত্ব, রজ, তম স্বভাব বিশিষ্ট মহৎ তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। আবার পর্যায়ক্রমে এই বুদ্ধি হইতে সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণ বিশিষ্ট অহংকারের উৎপত্তি হয়। তিনি বলেন পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। সবই পঞ্চ মহাভূতের বিকার অর্থাৎ রূপান্তর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্য লক্ষণ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ে পরিণত হইতে ইন্দ্রিয়-গুলিকে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—এই তিন প্রকারের অহংকারকে আশ্রয় করিতে হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশ্য ক্রিয়া অহংকারের মধ্য দিয়াই প্রকটিত হয়। আবার এই দশটি ইন্দ্রিয়ই মনের সাহায্যে তাহাদের নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে। কাজেই সুশ্রুত বলেন—মন দশটি ইন্দ্রিয়ের গুণবিশিষ্ট এবং অহংকারের আধারস্থল।

অহম্মন্যতা ও অহংকারের প্রভেদ

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—এই অহংবোধ তীব্র হইলে তাহাকে অভিসংপ্লব বা অহম্মন্যতা বলে। তবে অহংকার কিন্তু অহম্মন্যতা নহে। ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া সমাধার জন্য যে অহংবোধ তাহাই অহংকার।

তস্মাদব্যক্তান্মহানুৎপদ্যতে তল্লিঙ্গ এব।
তল্লিঙ্গাচ্চ মহতস্তল্লিঙ্গ এবাহঙ্কার উৎপদ্যতে।

স চ ত্রিবিধো বৈকারিকস্তৈজসো ভূতাদিরিতি
তত্র বৈকারিকাদহঙ্কারাত্তৈজস সহায়াৎ
তল্লক্ষণান্যেব একাদশেন্দ্রিয়াণি উৎপদ্যন্তে
তদ্যথা শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণ-
বাগ্ঘস্তোপস্থ-পায়ু-পাদ মনাংসীতি
তত্র পূর্বাণি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, ইতরাণি
পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি, উভয়াত্মকং মনঃ।

[সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান, প্রথম অধ্যায়—শ্লোক ২]

ব্যাখ্যা ও বিচার পূর্বেই করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের সমস্ত আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে পেঁাছাইতে পারি—

১। মন অতীন্দ্রিয়। মনকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বোঝা যায় না—অথচ মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক্ ধারণা করা যায়। কোন্ ইন্দ্রিয়ের কি বোধ তাহা বুঝিতে হইলেও মনকে প্রয়োজন। এমন কি ইন্দ্রিয়গণের শুভ বা অশুভ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির হেতুও মন।

২। মন ও আত্মার ক্রিয়ার সংযোগে মনের কার্য নির্বাহিত হয়। মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে অহংকার জন্মে। সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিগুণের প্রভাবে অহংকারের মধ্য হইতেই ইন্দ্রিয় সকল জন্মে। মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া সুশ্রুতে বলা হইয়াছে এবং দশটি ইন্দ্রিয়েরই ক্রিয়াবিশিষ্ট এই মন।

৩। অহংকার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট সচেতন জীব সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণযুক্ত ইন্দ্রিয়গণের কার্য সম্পাদনের জন্য মনের সক্রিয় সাহায্য গ্রহণ করে। মন নিষ্ক্রিয় হইলে এই সকল ইন্দ্রিয়ও নিষ্ক্রিয় হয়। অচেতন দেহে সব কিছু বর্তমান থাকিতেও মনের নিষ্ক্রিয়তার জন্য ইন্দ্রিয়গণও চেতনাহীন হয়। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, অহংবোধ সব কিছুই মনকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়।

মনের সংজ্ঞা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তসমূহ

এই অধ্যায়ে মন কি—এই সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণার সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করা হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

মনের অধিষ্ঠান

মনের অধিষ্ঠান কোথায় ? অর্থাৎ দেহের কোন্ স্থান হইতে মন তাহার রহস্যময় অস্তিত্বের সন্ধান দেয় ? মানসজীবনের দৈহিক ভিত্তি কিছু আছে ? এই প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবিদ্যার সহিত আয়ুর্বেদে মনোদর্শনের বিস্তর পার্থক্য ! তুলনামূলক বিচার করিতে বসি নাই এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তবুও আগে আয়ুর্বেদাচার্যগণের মতবাদ আলোচনা করিয়া অল্প কথায় আধুনিক মনোবিদ্যার মতবাদও উল্লেখ করিব। আয়ুর্বেদকারগণের মতে হৃদয় চেতনার স্থান।

হৃদয়ং চেতনাধিষ্ঠানমেকম্।

[চরক সংহিতা, শারীর স্থান, ৭ম অধ্যায়—শ্লোক ১০]

বিচার্য বিষয়—এই হৃদয় কোন্ হৃদয় ? হৃদ্‌যন্ত্র ? না সাধারণতঃ মন অর্থে হৃদয় নামক বাক্যটি যেভাবে ব্যবহার করা হয় তাহাই ? মানুষ বলে—"তাহার দুর্ব্যবহারে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল।" এখানে সত্যই কাহারও হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু লোকে হৃদয়ই বলে।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান। তাহার উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ যুক্তিনির্ভর এবং প্রমাণ সাপেক্ষ। চরক সংহিতার উক্ত শ্লোকে কাব্যের ভাবে হৃদয় কথাটি ব্যবহার হয় নাই।

হৃদয়ের স্থান ও তাহার বর্ণনায় বলা হইয়াছে ঃ

শোণিত-কফ-প্রসাদজং হৃদয়ং যথাশ্রয়া
হি ধমন্যঃ প্রাণবহাঃ। তস্যাধো বামতঃ
প্লীহা ফুসফুসশ্চ দক্ষিণতো যকৃৎ ক্লোম চ।
তদ্ হৃদয়ং বিশেষেণ চেতনা-স্থানমত-
স্তস্মিংস্তমসাবৃতে সর্বপ্রাণিনঃ স্বপন্তি।

পুণ্ডরীকেণ সদৃশং হৃদয়ং স্যাদধোমুখং।
জাগ্রতস্তদ্বিকশতি স্বপতশ্চ নিমীলতি।

[সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান, চতুর্থ অধ্যায়—শ্লোক ১৫]

রক্ত ও কফের সার হইতেই হৃদয় জন্মে। প্রাণবাহী ধমনী সকল হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বামদিকে প্লীহা এবং ফুসফুস, দক্ষিণে ফুসফুস, যকৃৎ ও ক্লোম। হৃদয় চেতনার স্থান। অতএব তম দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে প্রাণিগণ নিদ্রাভিভূত হয়। হৃদয়ের স্থান সংস্থান এবং পারি-পার্শ্বিক প্রত্যঙ্গ সকলের বিবরণে বোঝা যায় এই হৃদয় হৃদযন্ত্রই। কবির কাব্যের ভাষার হৃদয় নহে।

তর্ক উঠিবে হৃদয় চেতনার স্থান। তাহা হইলে মন ও চেতনা সমার্থ-বাচক কিনা। চেতনা তম দ্বারা আবৃত হইলে মানুষ সুপ্ত হয়, কিন্তু
মন ও চেতনা ঘুমাইয়া মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখা মনের ক্রিয়া। (স্বপ্ন অধ্যায়ে ইহা বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।) তাহা হইলে চেতনা সুপ্ত হইলেও মন সুপ্ত হয় না। এইবার হৃদয় চেতনার সহিত মনেরও স্থান কিনা—সে বিচারে উপস্থিত হওয়া যাক।

আত্রেয় বলেন—

মনোবহানাং পূর্ণত্বাদ্দোষৈরতি বলৈস্ত্রিভিঃ
স্রোতসাং দারুণান্ স্বপ্নান্ কালে পশ্যতি দারুণে।

[চরক সংহিতা, ইন্দ্রিয় স্থান, ৫ম অধ্যায়—শ্লোক ২৭]

মনের বাহক স্রোত সকল কুপিত ত্রিদোষের দ্বারা পূর্ণ হইলে মানুষ দারুণ সময়ে ভয়াবহ এবং অমঙ্গলজনক স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। মনোবহ স্রোত সকলের অবরোধে তাহাদের গতি বিপরীতমুখী হওয়াতেই দারুণ স্বপ্ন মানুষ দেখিয়া থাকে। আবার স্বপ্ন সব সময় দারুণ হইবে এ নাও হইতে
মনোবহ স্রোত ও বায়ু পারে। যেহেতু দেহী আহার বিহারে কিছু না কিছু ত্রুটি করিয়া থাকে এবং যেহেতু তাহার ত্রিদোষ সব সময়ে সম অবস্থায় থাকে না, সেহেতু স্বপ্ন দেখা প্রায় স্বাভাবিকই। এখন প্রশ্ন হইতেছে মনোবহ স্রোত কোনগুলি ?

বায়ুই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে বহন করে—সর্বশরীরস্থ ধাতুদিগের বাহক যন্ত্র।

বায়ুস্তন্ত্র যন্ত্রধরঃ, প্রাণোদান সমান ব্যানাপানাত্মা প্রবর্ত্তক-চেষ্টানামুচ্চাবচানাং নিয়ন্তা প্রণেতা চ মনসঃ। সর্বেন্দ্রিয়াণামুদ্যোগকরঃ সর্বেন্দ্রিয়াণামভিবোঢ়া। সর্বশরীর ধাতু ব্যূহকরঃ, সন্ধানকরঃ শরীরস্য প্রবর্ত্তকোবাচঃ, প্রকৃতিঃ স্পর্শ শব্দয়োঃ শ্রোত্র স্পর্শনেয়োর্মূলং। হর্ষোৎসাহয়োর্যোনিঃ।

[চরক সংহিতা, সূত্রস্থানম্, দ্বাদশ অধ্যায়—শ্লোক ৮]

বায়ু শরীরতন্ত্র এবং শরীর যন্ত্র সমূহের ধারক প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান প্রভৃতি চেষ্টার প্রবর্ত্তক, শরীরের উচ্চাবচ স্থানসমূহের নিয়ন্তা, মনের প্রণেতা, সর্বেন্দ্রিয়ের উদ্যোগকারক। সর্ব ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যকে ইন্দ্রিয়ের নিকট বহন করিয়া লইয়া যায়। সর্ব শরীরস্থ ধাতুদিগের বাহক এই বায়ু। সর্ব শরীরে কি ঘটে বা ঘটা প্রয়োজন তাহার সন্ধান দেয়। বায়ুই মানুষকে বাক্যের ক্ষমতা দেয়, বাক্য প্রবর্ত্তন করে। কর্ণের শব্দবোধ, ত্বকের স্পর্শবোধ বায়ুর সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। হর্ষ, উৎসাহ, দুঃখ প্রভৃতির অনুভব হৃদয়ে বাহিত হয় বায়ুর দ্বারা। পূর্ব অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মনের প্রয়োজন এবং বায়ু যে এই মনের প্রণেতা এই শ্লোকে তাহা দেখা যাইতেছে। হর্ষ, উৎসাহ প্রভৃতি অনুভব মনের ক্রিয়া এবং হর্ষ, উৎসাহ প্রভৃতি হৃদয়ে বাহিত হয় বায়ুর দ্বারা। তাহা হইলে হৃদয় যেমন চেতনার স্থান তেমনই মনেরও স্থান। শ্রীডল্লন তাঁহার নিবন্ধসংগ্রহে বলিয়াছেন—

চেতনা সহচরিতং মনোঽপি বিশেষেণ হৃদয়াধিষ্ঠানং মতম্।

চেতনা সহচর মনেরও অধিষ্ঠান এই হৃদয়। এই প্রমাণ ও যুক্তি ছাড়াও গর্ভস্থ ভ্রূণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বুদ্ধি, প্রাণ, চেতনা ইত্যাদি কি ভাবে জন্মে তাহার আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে আচার্যগণের মতে হৃদয় যেমন চেতনার স্থান আবার চেতনা-সহচর মনেরও স্থান। ভরদ্বাজ, সুশ্রুত সকলেই বলেন গর্ভের চতুর্থ মাস হইতে ভ্রূণের চেতনার বিকাশ হইতে থাকে। এবং পঞ্চম মাস হইতে চেতনার স্থান হৃদয় স্পন্দিত হইতে থাকে। এই সময় অর্থাৎ ভ্রূণের হৃদয় সক্রিয় হইবার পর কি ঘটে তাহাই বিচার করা যাক। এই সময় হইতে গর্ভিণীকে দ্বিহৃদয় বা দৌহৃদিনী বলা হয়। অর্থাৎ ভ্রূণের হৃদয় এবং মাতার হৃদয় একই ইচ্ছায় পূর্ণ হয়। ভ্রূণের হৃদয়ের ইচ্ছা সকল মাতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। ফলে মাতার যে সমস্ত নূতন ধরনের ইচ্ছা

হৃদয়ই মনের স্থান

আকাঙ্ক্ষা জন্মে তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ সন্তানের দোষগুণের কিছু আভাস পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন—মাতার মধ্য দিয়া ভ্রূণের ইচ্ছা পূর্ণ করা উচিত। ঐ ইচ্ছাগুলি পূর্ণ না হইলে সন্তান দেহে বা মনে বিকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

কস্থাত্তৎ স্থানত্বাত্তস্মাদ্ গর্ভচতুর্থে
মাস্যাভিপ্রায়ম্ ইন্দ্রিয়ার্থেষু করোতি
দ্বি হৃদয়াঞ্চ নারীং দৌ হৃদিনীমাচক্ষতে।
দৌহৃদ বিমাননাং কুব্জং কুণিং খঞ্জং
জড়ং বামনং বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা
নারী সুতং জনয়তি।

[সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান, তৃতীয়োঽধ্যায়—শ্লোক ১৫]

ইহার পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন নহে। ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা মনের ক্রিয়া। মন আপন ইচ্ছাকে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে পূর্ণ করিয়া থাকে। গর্ভস্থ ভ্রূণের ইন্দ্রিয়গুলি বিকশিত না হওয়াতে নিজের ইচ্ছাগুলি নিজে চরিতার্থ করিতে পারে না। সে সেই আকাঙ্ক্ষা মাতার মনে সঞ্চার করিয়া দেয়। ভ্রূণের এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কেন জন্মে? যেহেতু তাহার হৃদয় সক্রিয় হইয়াছে এবং ঐ হৃদয়ের সহিত মাতার হৃদয়ের যোগ স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। এবার এই সিদ্ধান্তে আসা কঠিন নহে যে আয়ুর্বেদাচার্যগণের মতে হৃদয় চেতনা ও মনের অধিষ্ঠান। এ বিষয়ে আরও প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। গর্ভস্থ সন্তানের কোন্ অঙ্গ আগে জন্মে একথা বলিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন মুনিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। কৃতবীর্য বলেন—হৃদয়ই আগে জন্মে যেহেতু হৃদয় মন ও বুদ্ধির স্থান।

হৃদয়ং জায়তে পূর্বং কৃতবীর্য্যোঽবদন্মুনিঃ
বুদ্ধেশ্চ মনসশ্চাপি যতস্তৎ স্থানমীরিতম্।

[ভাব প্রকাশ, পূর্ব খণ্ড, প্রথম ভাগ—শ্লোক ৩০৩]

সুশ্রুত সংহিতায় উদ্ধৃত ঃ হৃদয়মিতি কৃতবীর্য্যেণ বুদ্ধির্মনসশ্চ স্থানত্বাৎ

[সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান, তৃতীয় অধ্যায়]

মনের অধিষ্ঠান আয়ুর্বেদাচার্যগণের মতে যে হৃদয় ইহার প্রমাণ আমরা পাইলাম।

আধুনিক মনোবিদ্যায়—মানস জীবনে দেহের স্থান আলোচনায় মস্তিষ্ক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। যেহেতু সমস্ত শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী মস্তিষ্ক হইতে আসিয়াছে বা মস্তিষ্কে যাইয়া শেষ হইয়াছে এবং মস্তিষ্কই সকল সংবেদনের গ্রাহক এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রেরক—সেজন্য মস্তিষ্ক এবং তাহার সহযোগী স্নায়ুমণ্ডলী Afferent Neurons, Efferent Neurons, Sensory Nerves, Motor Nerves or Autonomic Nervous System এই সকল মিলিয়া মনের অধিষ্ঠান হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রেও একটি কথা বলিবার আছে। একটু আগে এই অধ্যায়ে বায়ুর যে ক্রিয়া আলোচনা করিয়াছি তাহাতে বায়ু "প্রণেতা চ মনসঃ"—"সর্বেন্দ্রিয়াণাং বোঢ়া" এবং "সর্বশরীরধাতুব্যূহকরঃ, সন্ধানকরঃ শরীরস্য" "হর্ষোৎসাহয়োর্যোনিঃ" এই সব উক্তি পাইয়াছি। প্রারম্ভিক সূত্রে বায়ুর সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের যে সামঞ্জস্য দেখান হইয়াছে তাহাতে বায়ুকে nervous impulse রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহা হইলে একথাও বুঝা যাইতেছে যে হৃদয়কে চেতনা ও মনের অধিষ্ঠানরূপে বর্ণনা করিলেও বায়ু যে মনের প্রণেতা এবং সর্ব-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার প্রাণস্বরূপ—একথা আচার্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। হর্ষ উৎসাহ প্রভৃতি ত মনের কাজ। কাজেই বায়ু ও মনের ক্রিয়ার ব্যাপারে যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এ বিষয়ে তাহারা নিঃসংশয় ছিলেন, একথাও প্রণিধানযোগ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

মনের উৎপত্তি ও ক্রমবৃদ্ধি

মন যেহেতু দেহের সহিতই জন্মে এবং দেহের বৃদ্ধির সঙ্গেই বিবর্তিত এবং পরিণত হইতে থাকে সে হেতু সংক্ষেপে দেহের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎপত্তির কথা বলা প্রয়োজন। ধন্বন্তরির মতে গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রথম অবস্থা হইতেই অতি সূক্ষ্মভাবে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জন্মিয়া থাকে। তাঁহার মতে আমের বা বাঁশের অত্যন্ত কাঁচ অবস্থাতেও তাহাতে আমের বা বাঁশের সব বৈশিষ্টই থাকে—একটু পুষ্ট হইলে তবে তাহা দেখিবার বা বুঝিবার মত অবস্থায় আসে। ভিন্ন ভিন্ন মুনিগণ দেহের কোন অংশ আগে সৃষ্টি হয়—এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন। ধন্বন্তরি তাহার মীমাংসা করিয়া যাহা বলিলেন—তাহা সুশ্রুত সংহিতায় বলা হইয়াছে।

সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গানি যুগপৎ সম্ভবন্তীত্যাহ
ধন্বন্তরি। গর্ভস্য সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে
বংশাঙ্কুরবৎ চূতফলবচ্চ।

[সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান, গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়—শ্লোক ২২]

ধন্বন্তরির মত প্রকাশ করেন গর্ভের চতুর্থ মাসে ভ্রূণের হৃদয় জন্মে, পঞ্চম মাসে মন জন্মে, ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি জন্মে। তবে হৃদয় জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই মন ও বুদ্ধি জন্মে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে তাহা স্ফুটতর হয়। অন্যান্য আয়ুর্বেদাচার্যগণও এই মতই পোষণ করেন।

যথা তথা দৈবযোগাদ্দোহৃদং জনয়েৎ হৃদি।
পঞ্চমে মনঃ প্রতিবুদ্ধতরং ভবতি। ষষ্ঠে
বুদ্ধি ... প্রব্যক্ততরঃ।

[সুশ্রুত সংহিতা, ঐ, শ্লোক—১৭।১৮]

অন্য মুনির মতেও—

পঞ্চমে মানসং ষষ্ঠে বুদ্ধিশ্চাপি প্রবুধ্যতে।
সর্বাঙ্গান্যুপাঙ্গানি ভৃশং ব্যক্তানি সপ্তমে।

[আয়ুর্বেদ সংগ্রহ, ৭ম সংস্করণ—পৃষ্ঠা ১১]

গর্ভস্থিত ভ্রূণের যে মন জাগরিত হয় তাহা তাহার ইচ্ছার বিকাশ হইতেই বোঝা যায়। ঐ সময় তাহার ইচ্ছাগুলিকে সে পূর্ণ করিতে পারে না। কারণ তাহার ইন্দ্রিয় সকল ভোগ্য বিষয়কে গ্রহণ করিবার মত পরিণতি লাভ করে নাই। যেহেতু মন জন্মিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জন্মান্তরের সংস্কারের প্রভাবে ইচ্ছাও জন্মিয়াছে। তখন তাহার হৃদয় গর্ভিণীর হৃদয়ের সাথে যোগ স্থাপন করে এবং আপন ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা গর্ভিণীর ইচ্ছারূপে প্রকাশ করে। সেইজন্য সে সময়ে গর্ভিণীকে দ্বি-হৃদয় বা দৌহৃদিনী বলা হয়।

ভ্রূণের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা

আচার্যগণ ভ্রূণের মানসিক বিকাশকে এত অগ্রসর অবস্থায় চিন্তা করিয়াছেন যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকলও মাতার মধ্য দিয়া চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা জন্মে। অবশ্যই ইহার কারণও তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—জন্মান্তর হইতে ধারাবাহিকভাবে আগত কর্ম ও চিন্তাধারার প্রভাব ভ্রূণের অপরিণত অবস্থাতেও ঐ সব ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া থাকে। (এখানে প্রারম্ভিক সূত্রের প্রথম সূত্র স্মরণ করিতে বলি। অধ্যাত্ম চেতনা আয়ুর্বেদের প্রতিটি চিন্তার বৈশিষ্ট্য।)

ধন্বন্তরি বলেন—

কর্মণা চোদিতং জন্তোর্ভবিতব্যং পুনর্ভবেৎ
যথা তথা দৈবযোগাদ্দৌহৃদং জনয়েৎ হৃদি।

[সুশ্রুত সংহিতা, ঐ—শ্লোক ১৭]

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—

তস্মাৎ তদাপ্রভৃতি গর্ভঃ স্পন্দতে প্রার্থয়তে
চ জন্মান্তরানুভূতমিহ যৎ কিঞ্চিৎ।
তদ্দ্বৈহৃদয্যমাচক্ষতে বুধাঃ। মাতৃজঞ্চাস্য
হৃদয়ং মাতৃহৃদয়াভি সম্বন্ধং
রসবাহিনীভিঃ সংবাহিনীভিস্তস্মাৎ তয়োস্তাভির্ভক্তিঃ।
সম্পদ্যতে।

[চরক সংহিতা, শারীর স্থানম্, মহতী গর্ভাবক্রান্তি, শারীর অধ্যায়—শ্লোক ১৮। ৪র্থ অধ্যায়]

দেখা যায় জন্মান্তর বাহিত কর্মফলের প্রভাবে চালিত হইয়া ভ্রূণ নানা-রকমের ইচ্ছা করিয়া থাকে। আরও আশ্চর্যের কথা গর্ভিণী হয়ত গর্ভ হইবার আগে ঐ রকমের কোনও আকাঙ্ক্ষা করে নাই, কিন্তু গর্ভস্থ শিশুর ইচ্ছার প্রভাবে নিজের স্বভাব বিরুদ্ধ ইচ্ছাও প্রকাশ করে। এই সমস্তের উদাহরণ স্বরূপ আচার্যগণ ঐ সব ইচ্ছাকে বিশ্লেষণ করিয়া ভবিষ্যৎ সন্তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু পূর্বাভাষ দিয়াছেন। তাঁহারা অন্ততঃ এই ধারণা করিয়াছেন যে মনের অত্যন্ত অঙ্কুর অবস্থায় যে সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাহাই ভবিষ্যৎ জীবনে ব্যক্তির জীবনকেও প্রভাবিত করে। কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিব। মাতার আহার-বিহার, সাজ-সজ্জা, মানসিক অবস্থা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া সন্তানের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে।

ভ্রূণের আকাঙ্ক্ষা বিচারের দ্বারা ভবিষ্যৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিচার

রাজসন্দর্শনে যস্যা দৌহৃদং জায়তে স্ত্রিয়ঃ।
অর্থবন্তং মহাভাগং কুমারং সা প্রসূয়তে ॥
দুকূল পট্টকৌশেয় ভূষণাদিষু দৌহৃদাৎ।
অলঙ্কারৈষিণং পুত্রং ললিতং সা প্রসূয়তে... ॥
আশ্রমে সংযতাত্মানং ধর্মশীলং প্রসূয়তে ॥
দেবতাপ্রতিমায়াস্তু প্রসূতে পার্ষদোপমং
দর্শনে ব্যালজাতীনাং হিংসাশীলং প্রসূয়তে।

[সুশ্রুত সংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, শারীর স্থান, গর্ভাবক্রান্তি শারীর অধ্যায়—শ্লোক ১৭]

গর্ভিণীর দৌহৃদবশতঃ রাজাকে দেখিবার বা রাজার বাড়ী যাইবার ইচ্ছা হইলে অর্থবান পুণ্যবান সন্তান জন্মে।

রেশম, পশম, পট্টবস্ত্র পরিবার ইচ্ছা হইলে সজ্জাবিলাসী সন্তান জন্মে। তপস্বীদের আশ্রম দেখিবার ইচ্ছা হইলে বা তপস্বীদের প্রতি ভক্তি জন্মিলে সংযতমনা, ধর্মশীল সন্তান জন্মে। বাঘ বা ঐ ধরনের হিংসাশীল প্রাণী দেখিবার প্রবল ইচ্ছা জন্মিলে খল বা ক্রূর সন্তান জন্মে। দেবপ্রতিমা দর্শন বা পূজাদি দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হইলে পার্ষদোপম অর্থাৎ পরিষদে গ্রহণযোগ্য সভ্য ও সৎ পুত্র জন্মে।

গর্ভিণীর দৌহৃদজ আকাঙ্ক্ষায় খাদ্যের বিচার করিতে গিয়া ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে বলিয়াছেন—এই বিচার করিতে বসিয়া একথা মনে রাখা প্রয়োজন,

যে সব খাদ্যে আকাঙ্ক্ষা দৌহৃদিনী অবস্থায় জন্মে গর্ভস্থাপনের আগে সে সব আকাঙ্ক্ষা সেই নারীর ছিল না, থাকিলেও এত প্রবলভাবে ছিল না। এইরূপ অবস্থাতেই মাত্র তাহা দৌহৃদজ আকাঙ্ক্ষা বলা যায়, অন্যথায় নহে।

গোধামাংসাহশনে পুত্রং সুষুপ্সুং ধারণাত্মকম্
গবাং মাংসে চ বলিনং সর্বক্লেশ সহন্তথা।
মাহিষে দৌহৃদাচ্ছুরং রক্তাক্ষং লোম সংযুতম্।
বরাহমাংসাৎ স্বপ্নালুং শূরং সঞ্জনয়েৎসুতম্।
মার্গাদ্বিক্রান্ত জঙ্ঘালং সদা বনচরং সুতম্।
সৃমরাগ্নি মনসং নিত্যভীতং চ তৈত্তিরাৎ
অতোহনুক্তেষু যা নারী সমভিধ্যাতি দৌহৃদম্।
শরীরাচার শীলৈঃ সা সমানং জনয়িষ্যতি।

[সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান, গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়—শ্লোক ১৭]

গোধা বা গোসাপের মাংস খাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে সন্তান নিদ্রালু ও ধারণক্ষম চিত্তযুক্ত হয়। গোমাংস খাইবার প্রবল ইচ্ছায় বলবান ও ক্লেশসহিষ্ণু সন্তান জন্মে। মহিষ মাংস ভোজনের আকাঙ্ক্ষায় রক্তচক্ষু লোমশ ও বলশালী সন্তান জন্মে। শূকর মাংসে প্রবল লোভ হইলে নিদ্রালু ও বীর সন্তান জন্মে। মৃগমাংস আকাঙ্ক্ষায় উদ্যোগী-বনচর ও দ্রুতগতিতে গমনকারী সন্তান হয়। সৃমর (মহাশূকর ইতি ডল্লনাচার্য) মাংসের আকাঙ্ক্ষা উদ্বিগ্নচিত্ত সন্তানের দ্যোতক। তৈত্তির মাংস ভীরু সন্তানের অগ্রদূত। এ ছাড়া বহু খাদ্য আছে যাহা বলা হয় নাই। সেই সব খাদ্যে প্রবল ইচ্ছা হইলে সেই সেই খাদ্যের স্বভাব বিচার করিয়া সন্তানের শরীর ও মন সম্বন্ধে পূর্বাভাষ হিসাবে স্থির করিতে হইবে।

পূর্বাভাসে যাহা বলা হইয়াছে তাহা চির-জীবন স্থায়ী নাও হইতে পারে।

এই স্তর হইতেই জগতের গতিশীলতা এবং প্রবাহিত কালস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে সর্বদাই পরিবর্তনশীল মনের প্রথম সন্ধান আচার্যগণ দিয়াছেন। মানুষের মন এই পৃথিবীতে আসিবার পর হইতেই পরিবেশ এবং নানা কারণের প্রভাবে নানাভাবে গতি পরিবর্তন করিয়া অন্যরূপ ধারণ করে। সেজন্যই এই সমস্ত পূর্বাভাস মানুষের সমস্ত জীবনব্যাপী স্থায়ী হয় না। কারণ মন, বায়ু, পিত্ত, কফ এবং সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই সকলের অধীন। এইগুলির শুষম অবস্থায় বা কিছু কিছু বিপর্যয়ের ফলে মন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন-

ধর্মী হয়। মানুষ যখন ধর্মক্রিয়া যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তখন সত্ত্বগুণের আশ্রয় নেয়। আবার সেই মানুষই কামনা বাসনা পূরণের সময় রজোগুণ প্রধান হইয়া ওঠে, কারণ রজোগুণ মানুষকে কামনা পূরণের জন্য প্রবৃত্তি দেয়। আবার সেই মানুষই কোনও সময়ে তম দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মোহাচ্ছন্ন হয় এবং অকর্মও করে। সকল গুণই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই মানুষে দেখা যাইতে পারে—কিন্তু মনের একই অবস্থায় সকল গুণ একই সঙ্গে আসিতে পারে না। (মনের সংজ্ঞা অধ্যায়ে আলোচিত মনের গুণ দ্রষ্টব্য।)

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—

নানাবিধানি তু খলু সত্ত্বানি তানি
সর্বাণি এক পুরুষে ভবন্তি। ন চ
ভবন্ত্যেক কালম্। একন্তু প্রায়োঽনুবৃত্ত্যাহ।

[চরক সংহিতা, শারীর স্থান, খুড্ডিকা গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়—শ্লোক ২২]

যাহা হউক দৌহৃদের ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারে আচার্যগণ গভীর মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন মাতার মধ্য দিয়া ভ্রূণের পূর্ব পূর্ব জন্মাশ্রিত আকাঙ্ক্ষা সকল পূর্ণ করা উচিত। তাহা না হইলে ভ্রূণের মন তাহার অজ্ঞাতেই আঘাত পায়। এই আঘাতের ফলে অংকুরেই যে বিকৃতি হয় তাহার ফলে তাহার দৈহিক বিকৃতি হইতে পারে। কারণ মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—

দৌহৃদ-বিমাননাং কুব্জং কুণিং খঞ্জং
জড়ং বামনং বিকৃতাক্ষম্ অনক্ষং বা
নারী সুতং জনয়তি। তস্মাৎ সা
যদ্যদিচ্ছেত্তত্তস্যৈ দাপয়েৎ। লব্ধ
দৌহৃদাহি বীর্যবন্তং চিরায়ুষঞ্চ
পুত্রং জনয়তি।

[সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান, গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়—শ্লোক ১৫]

দৌহৃদের অবমাননা করিলে অর্থাৎ দৌহৃদের সাধ পূর্ণ না করিলে কুব্জ, সংকুচিত করাঙ্গুলি বা বিকৃত হস্ত (ডল্লনাচার্য), খোঁড়া, জড়বুদ্ধি, বামন,

বিকৃতচক্ষু বা চক্ষুহীন সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে বীর্যবান, আয়ুষ্মান পুত্র জন্মে। আয়ুর্বেদকারগণের মতে যদিও এগুলি জন্মান্তরের সংস্কারমাত্র এবং প্রসবের পরে জগতের পরিবেশে এ সমস্তই পরিবর্তিত হইবে তথাপি গর্ভস্থ ভ্রূণের অপরিণত কিন্তু নিশ্চিত-ভাবে সৃষ্ট মনে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। তাহাতে দৈহিক বিকৃতি আসা সম্ভব। (আধুনিক মনোবিদ্যাতে এই ধরনের চিন্তাধারা স্বীকৃত। পরিণত জীবনেও আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হইলেও শুধু দেহেই যাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে এমন অনেক রোগের মূল কারণ মানসিক ভার-সাম্যের অভাব। এগুলিকে Psychosomatic disorder বলা হয়। Peptic ulcer-এর উৎপত্তিতে এবং রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে মনের সাম্য বা অসাম্য অনেকখানিই অংশ গ্রহণ করে। Neuro dermatitis নামক চর্মরোগের উৎপত্তি মূলতঃ মানসিক উদ্বেগ হইতে হয়।)

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—যদি দৌহৃদ সাধ এমন হয় যে সে বস্তু গর্ভিণীর পক্ষে অনিষ্টকর তখন কি করা যাইবে? সেই অবস্থায় নানা উপায় চিন্তা করিয়া সেই অহিত বস্তুকে যতটা সম্ভব হিতকর বস্তুতে পরিণত করিতে হইবে। তবুও একেবারে সাধ অপূর্ণ রাখা যাইবে না। তাহা হইলে বায়ু কুপিত হইয়া গর্ভের বিনাশ বা বিরূপতা সৃষ্টি করিতে পারে। মনের অধিষ্ঠান অধ্যায়ে বায়ুর কারকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে বোঝা গিয়াছে বায়ু মনের প্রণেতা সর্বেন্দ্রিয়ের উদ্যোগকারক এবং আরও অনেক গুণবিশিষ্ট। সুতরাং বায়ু কুপিত হইলে গর্ভস্থ ভ্রূণের বিনাশ বা বিকৃতি ঘটিতে পারে।

(পূর্বে আলোচনা করিয়াছি—আধুনিক বিজ্ঞানের Nervous System-ই কার্যতঃ বায়ু নামে আয়ুর্বেদে কথিত।)

শিশু জন্মিবার পর :

ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর ইন্দ্রিয় সকল এবং মন সক্রিয় হয়। তখন নিজের ইচ্ছাসকল ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবের ক্ষমতা জন্মে। এ সময় শিশুকে লালন-পালনের মধ্য দিয়া যাহাতে তাহার মন সঠিক পথে যাইয়া বিকৃতি এড়াইতে পারে—সেজন্য সঠিক নির্দেশ আচার্যগণ দিয়া গিয়াছেন। শিশুর দেহের পুষ্টি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে যে নির্দেশ

আছে তাহা এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। মনের দিক হইতে কি কি করা উচিত তাহার নির্দেশ সকলই আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিব।

বালমঙ্কে সুখং দধ্যান্ন চৈনং তর্জয়েৎ কদাচিৎ।
সহসা বোধয়েন্নৈব নাযোগ্যামুপবেশয়েৎ।

[ভাব প্রকাশ (ভাব মিশ্র), বাল প্রকরণ—শ্লোক ৩৫]

শিশুকে যথেষ্ট আরাম দিয়া কোলে রাখিবে। তাহাকে ধমকাইবে না। ঘুমন্ত অবস্থা হইতে জাগাইবে না। যেমন তেমন করিয়া বসাইবার চেষ্টা করিবে না। তর্জন গর্জন বা ধমকাইবার ফলে শিশুর মনে বিরূপ প্রতি-ক্রিয়া হয়। মনের অবাধ স্বাভাবিক বিচরণের ক্ষেত্র হইতে তর্জন গর্জন

শিশুর মন

শিশুর মনকে অন্যক্ষেত্রে লইয়া যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুর মন স্বপ্নরাজ্যে বাস করে বা তাহার মন সম্পূর্ণ বিশ্রামের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। সে সময় বাহিরের পরিবেশের সহিত তাহার কোনও সম্পর্কই থাকে না। হঠাৎ জাগাইলে সেই জগৎ হইতে তাহার মন বাহ্যিক জগতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। শিশুর মন ও ইন্দ্রিয় সবই অপরিণত। এমন অবস্থায় বাহিরের পরিবেশে খাপ খাওয়াইতে বেগ পাইতে হয়। এই যে অন্তর্বর্তী সময়, এই সময়ে তাহার সাময়িক বিভ্রান্তি জন্মে যাহা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

নাকুষ্য স্থাপয়েৎ ক্রোড়ে ন ক্ষিপ্রং শয়নে ক্ষিপেৎ।
রোদয়েন্ন কদাচিৎ কার্যে বিধিমাবশ্যকং বিনা।।

[ভাব প্রকাশ, বাল প্রকরণ—শ্লোক ৩৬]

হঠাৎ টানিয়া কোলে নিবে না বা বিছানায় হঠাৎ জোরের সঙ্গে শোয়াইবে না। বিনা কারণে কাঁদাইবে না। অর্থাৎ তেল মাখান, কাজল দেওয়া বা দরকার মত ঔষধ সেবনের সময় ছাড়া অনাবশ্যক কাঁদাইবে না। এখানেও পূর্বের বিশ্লেষণই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ পরিবর্তিত অবস্থায় ধীরে ধীরে খাপ খাওয়াইয়া মনকে যথাযথ পথে বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া। না হইলে ছোট ছোট মানসিক আঘাতেরও যোগফল কালক্রমে বিরাট হইতে পারে। কাজেই মনের ক্রমবিকাশের পথে অত্যন্ত সহজ ভাবে স্বাভাবিক গতিতে যাহাতে মনের বৃদ্ধি হয় সেইজন্য এই উপদেশগুলি।

তচ্চিত্তমনুবর্তেত তং সদৈবানুমোদয়েৎ।
সংসেবিতমনা এবং নিত্যমেবাভিবর্ধতে।।

[ভাবপ্রকাশ, বালপ্রকরণ—শ্লোক ৩৭]

বালকের মনের সন্তোষ জন্মে এমন কাজ করিবে। তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবে। কারণ মন প্রফুল্ল থাকিলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়মিত ভাবে বাড়িয়া উঠিবে। আর একটু বড় হইলে যদি শিশু কাঁদে বা খাইতে না চায় কিংবা যাহা করা উচিত তাহা না করিতে চাহে তবে বুঝাইয়া মিষ্ট বাক্যের দ্বারা তাহা করাইতে হইবে। কখনও বা তাহাকে ভূত, প্রেত, পিশাচ, পূতনা প্রভৃতির নাম ; বা বাঘ, ভালুক, সাপ প্রভৃতিকে ডাকার নাম করিয়া ভয় দেখাইয়া কার্য উদ্ধার করিবে না। শিশুর অপরিণত মনে ঐ ভয় চিরস্থায়ী হয় এবং ভবিষ্যতে ভীরুতা আসে।

এ সম্বন্ধে আত্রেয় বলেন-

নহ্যস্য বিত্রাসনং সাধু তস্মাৎ তস্মিন্
রুদত্য ভুঞ্জানে বান্যত্র বিধেয়তামাগচ্ছতি
রাক্ষস পিশাচ পূতনাদীনাং নামান্যাহ্বয়তা
কুমারস্য বিত্রাসনার্থং নামগ্রহণং ন কার্যং স্যাৎ।

[চরক সংহিতা, শারীর স্থান, জাতী সূত্রীয় অধ্যায়—শ্লোক ১২৩। ৮ম অধ্যায়]

ব্যাখ্যা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে মনের উৎপত্তিকাল এবং গর্ভ:হইতেই তাহার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আচার্যগণের মত আলোচনা করা হইল। তত্ত্বের সহিত ব্যবহারিক প্রয়োগগুলিও বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। শুধু তত্ত্বগত দিক আলোচনাতেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজ শেষ হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুস্থ মন এবং মনের অসুস্থতার কারণ

এই অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক সুস্থতা নাগরিক জীবনের একটি অপরিহার্য দিক। ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তির শরীর, তাহার পারিবারিক জীবন, আবার বৃহত্তর দৃষ্টিতে সামাজিক জীবন—সবই মানুষের মানসিক সুস্থতার উপর নির্ভর করে। কাজেই এই অধ্যায়ে বর্ণিত আয়ুর্বেদাচার্য-গণের মনের সুস্থতা এবং বিকৃতির তাত্ত্বিক দিকটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—দেহীর শুভ প্রবৃত্তি বা অশুভ নিবৃত্তির হেতু হইতেছে আধ্যাত্মিক দ্রব্যগণ।

মনো মনোঽর্থো বুদ্ধিরাত্মা চেত্যধ্যাত্ম
দ্রব্যগুণ সংগ্রহঃ। শুভাশুভ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হেতুশ্চ।

[চরক সংহিতা, সূত্র স্থানম্, ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়—শ্লোক ৫)

মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মা—এই কয়টি আধ্যাত্মিক দ্রব্যগণ নাম দিয়া যে চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল এই চারিটির প্রভাবেই আধ্যাত্মিক দ্রব্যগণ মানুষের সামগ্রিক শুভ বা সামগ্রিক অশুভের কারণ ঘটে। সামগ্রিক বলিতে মানুষের দেহ মন পরিবার ও সমাজ জীবনের কথা উল্লেখযোগ্য।

তদর্থাতি যোগাযোগ মিথ্যা যোগাৎ সমনস্কামিন্দ্রিয়ং
বিকৃতি মাপদ্যমানং যথাস্বং বুদ্ধ্যুপঘাতায়
সম্পদ্যতে।

(ঐ, ঐ - শ্লোক ৮)

ইন্দ্রিয়গণের অতিযোগ অযোগ মিথ্যাযোগ হইতে ইন্দ্রিয়গণের ত বটেই মনেরও বিকৃতি ঘটে। ফলে বুদ্ধিনাশও ঘটে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি মহাভূতের রূপান্তর। ঐ পাঁচটি মহাভূতের বিকারের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকারও হয়। যেহেতু ইন্দ্রিয়সকল মনের অধীন এবং মনের সাহায্যেই তাহাদের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় সেহেতু মনেরও বিকৃতি তাহার পিছন পিছনই আসে। মনের সহিত বুদ্ধিরও অপঘাত হয়। এইবার ইন্দ্রিয়গণের আযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ বা হীনযোগ সম্বন্ধে উদাহরণের সহিত বর্ণনা করিব।

প্রথমেই ধরা যাক দর্শনেন্দ্রিয়ের কথা।

চক্ষুর অযোগ, অতিযোগ ও হীনযোগ ঃ—

তত্রাতি প্রভাবতাং দৃশ্যানামতিমাত্রং দর্শনমতিযোগঃ সর্বশোঽদর্শনমযোগঃ।

অতিসূক্ষ্মাতিশ্লিষ্টাতি বিপ্রকৃষ্ট রৌদ্র
ভৈরবাদ্ভুতদ্বিষ্ট বীভৎস বিকৃতাদিরূপদর্শনং
মিথ্যাযোগঃ।

[চরক সংহিতা, সূত্র স্থানম্, ত্রিস্রৈষণীয় অধ্যায়, ১১শ অধ্যায়—শ্লোক ২৭]

বাগভট বলেন—

হীনোঽর্থেনেন্দ্রিয়া স্যাল্পঃ সংযোগঃ স্বেন নৈব বা
অতিযোগোঽতি সংসর্গঃ সূক্ষ্ম ভাস্বর ভৈরবম্
অত্যাসন্নাতিদূরস্থং বিপ্রিয়ং বিকৃতাদিচ।
যদক্ষ্না বীক্ষ্যতে রূপং মিথ্যা যোগঃ স দারুণঃ

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, সূত্র স্থান, ১২শ অধ্যায়—শ্লোক ৩৪।৩৫)

অত্যন্ত উজ্জ্বলরূপ পুনঃ পুনঃ দেখাকে অতিযোগ বলা হয়। আবার একেবারে কিছুই না দেখা অর্থাৎ সর্বদা অন্ধকারে থাকাকে অযোগ বলা হয়।

অতি দূরের জিনিস, অতি নিকটের জিনিস বা অতি সূক্ষ্ম জিনিস, অদ্ভুত বীভৎস ভয়ঙ্কর দৃশ্যসকল দেখা ; অত্যন্ত নিম্নস্তরের দৃশ্য দেখা, রৌদ্ররস পরিপূর্ণ দৃশ্যাদি দেখা—এ সমস্তই দর্শনেন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ বা হীনযোগ। এই ইন্দ্রিয়সকলের হীনযোগাদি আলোচনার সঙ্গে মন ও বুদ্ধির

মিথ্যাযোগাদি আলোচনাও বিশ্লেষণ করিব। কিভাবে এই মিথ্যাযোগাদির ফলে মনোবৈকল্য বা মানসিকরোগ হয় তাহাও আলোচনা করিব। এই আলোচনার পূর্বে একটি কথা জানিয়া রাখা ভাল যে মনের বিকলতা অর্থই উন্মাদ রোগ নহে।

আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ মানুষ বলিয়া যাহাদের মনে করি তাহারা সকলেই মনের দিক দিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ নহে :

আমরা আমাদের চারিপাশে যে সমস্ত মানুষ দেখি তাহাদিগকে আমরা মানসিক সুস্থ মানুষই বলি। অর্থাৎ কেহই উন্মাদ নন। উন্মাদ না হইলেই যে মনের দিক দিয়া সকলেই সম্পূর্ণ সুস্থ এমন কথা নিশ্চয়ই সত্য নয়। বিভিন্ন কারণের মধ্য দিয়া মানুষের মনের সমতা যে নষ্ট হয় এবং মানুষ তাহার জন্য শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতায় ভোগে এই সত্য উপলব্ধি করিয়া আয়ুর্বেদকারগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন এই হীনযোগাদি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া। এইবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিব।

দর্শনেন্দ্রিয়ের অযোগ কিভাবে মানসিক বৈকল্য আনিতে পারে :

অতীতে এমন ঘটনা জানা গিয়াছে যে নির্জন এবং অন্ধকার কারাগারে দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখিলে মানুষ সর্ব ইন্দ্রিয়ের অযোগহেতু উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অযোগের উদাহরণ নিতান্তই সীমিত। কাজেই বেশী আলোচনা না বাড়াইয়া যে উদাহরণ সর্বাপেক্ষা প্রকট তাহার আলোচনাই করিব। সে উদাহরণ হইল হীনযোগের। উগ্র ভয়ংকর বীভৎস দৃশ্যসকল মনকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করে। কোন হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য সাধারণভাবে মানুষের মনকে এত জোরে নাড়া দেয় যে মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। দলবদ্ধভাবে হত্যা, দস্যুতা, সাম্প্রদায়িক বা রাষ্ট্রনৈতিক কারণে হত্যা, নিপীড়ন প্রভৃতি দৃশ্য দেখিয়া অনেকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে, ইহার প্রমাণের অভাব নাই। বীভৎস দৃশ্য ও মারামারি দাঙ্গা প্রভৃতির দৃশ্যসম্বলিত নাটকও মনের সমতা নষ্ট করে। বীভৎস রৌদ্ররসে পরিপূর্ণ বা বিকৃত রুচির নাটকগুলি একই সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মূলকর্তা মনকে সমতার রেখা হইতে নামাইতে সাহায্য করে। পরিবেশ যদি এমন হয় যে, বহুসময় ধরিয়া ঐ দৃশ্য দেখিতে হয় তবে দর্শকের মন নিশ্চয়ই প্রভাবিত হয়। একথা সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধেও একইভাবে প্রযোজ্য।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের হীনযোগ, অতিযোগ ঃ

তথাতিমাত্রস্তনিত পটহোৎ ক্রুষ্টাদীনাং
শব্দানামতিমাত্রং শ্রবণমতি যোগঃ।
সর্বশোঽশ্রবণমযোগঃ।
পরুষেষ্ট বিনাশোপঘাত প্রধর্ষণ
ভীষণাদিশব্দ শ্রবণং মিথ্যাযোগঃ।

(চরক সংহিতা, সূত্রস্থানম্, ১২শ অধ্যায়—শ্লোক ২৮)

অত্যন্ত উচ্চশব্দ দীর্ঘকাল ধরিয়া শোনা, সর্বদা যানবাহনের কর্কশ শব্দ, চিৎকার, উচ্চরবে বাজান বাদ্যশব্দ প্রভৃতি অতিযোগ।

হীনযোগ ঃ

কর্কশ ভাষা, ভীষণ শব্দ, নির্যাতিত ব্যক্তির আর্তনাদ, দুঃসংবাদ শোনা —এ সমস্তই মিথ্যাযোগ বা হীনযোগ। এই হীনযোগ বা অতিযোগ এক একটি ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলেও ইহাদের আঘাত কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনের উপরেই গিয়া পড়ে। ফলে ধীরে ধীরে মনের পরিবর্তন আসে। অত্যন্ত উচ্চশব্দমুখরিত কলকারখানায় দীর্ঘকাল ধরিয়া কাজ করিতে করিতে পরিণত বয়সে স্নায়ুবিকার ঘটিবার উদাহরণের অভাব নাই। অনবরত দুঃসংবাদপূর্ণ সমাজে মানুষ যখন চারিদিক হইতে হত্যা, লুণ্ঠন, দস্যুতা প্রভৃতির সংবাদ শুনিতে পায় তখন সমাজের অধিকাংশ লোকই যে মনো-বৈকল্যে অল্পাবিস্তর ভোগে ইহার উদাহরণ চতুর্দিকেই।

(এ ছাড়াও অত্যন্ত কর্কশ ধরনের আদেশ পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে সেই আদেশকারীর কথাই সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া আর এক মনো-বৈকল্য। এই ধরনের ক্রিয়া বর্তমান জগতে যুদ্ধবন্দীদের উপরে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। চলতি কথায় এই প্রক্রিয়াকে মগজ ধোলাই বলা হয়।)

স্পর্শেন্দ্রিয়ের অতিযোগ ও হীনযোগাদি ঃ

স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়ে মহর্ষি আত্রেয় বিশেষ জোরের সহিতই বলিয়াছেন। কারণ ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয়ের মত ব্যাপক আর কোন ইন্দ্রিয়ই নহে।

তত্রৈকং স্পর্শনেন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয় ব্যাপকং
চেতঃ, সমবায়িস্পর্শনেন্দ্রিয়ব্যাপ্তেব্যাপকমপি
চেতস্তস্মাৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপকস্পর্শকৃতো
যোভাব বিশেষঃ সোঽয়মনুপশয়াৎ পঞ্চবিধস্ত্রিবিধ
বিকল্পো ভবত্যসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগঃ ।
সাত্ম্যার্থোহ্যুপশয়ার্থঃ ।

(চরক সংহিতা, সূত্র স্থান. ১১শ অধ্যায়—শ্লোক ৩২)

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয়ই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। কারণ স্পর্শেন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। সকল ইন্দ্রিয়ই স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রভাবে নিজ নিজ ক্রিয়া করে। যেমন আলোকের স্পর্শ না পাইলে চক্ষুর ক্রিয়া হয় না। শব্দের স্পর্শ না হইলে শ্রবণের ক্রিয়া হয় না। স্বাদ লইবার মত পদার্থের সহিত স্পর্শ না হইলে রসনার ক্রিয়া হয় না। স্পর্শেন্দ্রিয় বায়ুপ্রধান। বায়ু সর্বশরীরে ব্যাপকভাবে অবস্থান করে। বায়ু মনেরও প্রণেতা। স্পর্শেন্দ্রিয় সর্বইন্দ্রিয়েই ব্যাপ্ত। সেজন্য স্পর্শকেও পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অনুযায়ী পাঁচ রকমে ভাগ করা যায়। কাজেই যদিও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অতিযোগ বা হীনযোগকে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অতিযোগাদি বলা যায়, তবুও স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিজের অতিযোগাদি সম্বন্ধে পৃথকভাবেও বলা হইয়াছে।

তথাতিমাত্রশীতোষ্ণাদীনাং স্পৃশ্যানাং
স্নানাভ্যঙ্গোৎসাদনাদীনাঞ্চাত্যুপ সেবনমতিযোগঃ।
সর্বশোঽনুপসেবনমযোগঃ। বিষম স্থানাভিঘাতা-
শুচিভূতসংস্পর্শাদয়শ্চেতি মিথ্যাযোগঃ।

(চরক সংহিতা, ঐ—শ্লোক ৩১)

অত্যন্ত শীতল বা অতি উষ্ণ জলে স্নান বা অত্যন্ত উষ্ণ বা শীতল অভ্যঙ্গ (প্রসাধন দ্রব্যাদি) শরীরে মাখা এবং প্রকৃতিজাত অত্যন্ত শীতল বা অতিশয় গরম জল বা বায়ু হইতে শরীর রক্ষার ব্যবস্থা না করা এই সবই হইতেছে অতিযোগ। অত্যন্ত অসমতল কর্কশ স্থানে সর্বদা চলাফেরা বা শুইয়া থাকা বা গড়াইয়া যাওয়া ; অশুচি দ্রব্য বা মানুষের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে সর্বদা থাকা বা শরীরে পুনঃ পুনঃ আঘাত গ্রহণ এ সমস্তই স্পর্শের হীন-যোগ। অত্যন্ত উত্তপ্ত পরিবেশে বাস করিতে থাকিলে দেহের সহিত মানসিক নানা অবসাদ সৃষ্টি হয়, এ কথা আধুনিক বিজ্ঞানে স্বীকৃত। সামান্য ধরনের

জন্মগত মনোবৈকল্য উত্তপ্ত পরিবেশে বাস করার ফলে বৃদ্ধি পায়। দৈহিক আঘাত পুনঃ পুনঃ ঘটিলেও মনোবৈকল্য ঘটিতে পারে। (এখানে বর্তমান কালের দুই একটি উদাহরণ সমস্ত যুক্তি বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া উদ্ধৃত করিতেছি। নির্জন কারা কক্ষে অল্প পরিসরে প্রায় অন্ধকার পরিবেশে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতে প্রায় বঞ্চিত করিয়া দীর্ঘকাল বন্দীকে রাখার পর সে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে—এমন ঘটনা অনেকই ঘটিয়াছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অযোগও যে মনোবৈকল্য ঘটায় এটি তাহারই উদাহরণ। যুদ্ধ-বন্দীদের শিবিরে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের প্রাত্যাহিক দৈহিক নির্যাতন শেষ পর্যন্ত অনেক মানুষকেই মানসিক দিক হইতে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে—এ ইতিহাসও বর্তমানে অনেকেই জানেন। ইন্দ্রিয়গণের হীনযোগের এগুলি উদাহরণ।) ইন্দ্রিয়সকলের অতিযোগাদির বিষয় আলোচনা করা হইল। এবার মনের হীনযোগ বিষয়ে আলোচনা করিব। মনের এবং বুদ্ধির অতিযোগ ও হীনযোগ মনোবৈকল্যের কারণ হইতে পারে।

মনসস্তু চিন্ত্যমর্থঃ। তত্র মনসো বুদ্ধেশ্চ
ত এব সমানাতিহীন মিথ্যাযোগাঃ প্রকৃতি বিকৃতি
হেতবো ভবন্তি। তত্রেন্দ্রিয়াণাং
সমনস্কানামনুপতপ্তানামনুপতাপায় প্রকৃতিভাবে
প্রযতিতব্যমেভির্হেতুভিঃ।

[চরক সংহিতা, সূত্র স্থানম্‌, ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়—শ্লোক ৯]

মনের বিষয় চিন্তা :

এস্থলেও মন ও বুদ্ধির যথাযোগ অতিযোগ হীনযোগ মিথ্যাযোগ মানুষের প্রকৃতি এবং বিকৃতির কারণ ঘটাইয়া থাকে। যাহাতে ইন্দ্রিয় ও মন স্বাভাবিক ভাবে প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহার জন্য যত্ন করা উচিত।

আবার কর্মেরও অতিযোগ, মিথ্যাযোগ ও হীনযোগ হইতে পারে।

কর্ম কি ?

কর্মবাঙ্মন-শরীর প্রবৃত্তিঃ
তত্র বাঙ্মনঃ শরীরাতি প্রবৃত্তি রতিযোগঃ।
সর্বশোহপ্রবৃত্তিরযোগঃ।

(চরক সংহিতা, সূত্র স্থান, একাদশ অধ্যায়—শ্লোক ৩৩)

বাক্য, মন ও শরীরের চেষ্টাকে কর্ম বলে। এই সমস্তের মিথ্যাযোগাদি নানাবিধ রোগের কারণ। শরীরের মিথ্যাযোগ বহু রকমের, তাহা এখানে আলোচ্য বিষয় নহে। বরং বাক্য ও মনের মিথ্যাযোগ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা যাক।

বাক্যের মিথ্যা যোগ ঃ

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে শুধুমাত্র বাচনিক মিথ্যাযোগেও মনের সমতা নষ্ট হয় এবং মনের সুস্থতা থাকে না এই বিশ্লেষণ আয়ুর্বেদকারগণ করিয়াছেন। প্রতিটি কথাই যুক্তিসহ এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত। প্রথমে মহর্ষি আত্রেয়ের উক্তির উল্লেখ করিয়া সবিশেষ আলোচনা করা যাক।

আত্রেয় বলেন—

সূচকানৃতাকাল কলহবিপ্রিয়া বন্ধানুপচারপরুষবচনাদির্বাঙিমথ্যাযোগঃ।

(চরক সংহিতা, ১১শ অধ্যায়—শ্লোক ৩৫)

কাহারও নিন্দা করা ; মিথ্যা কথা বলা ; অকালে বাক্‌প্রয়োগ অর্থাৎ যে কথা বলা হইতেছে তাহা বলিবার সময় আসিবার আগেই বলিয়া ফেলা ; কলহ, অপ্রিয় কথা ; অসম্বন্ধ কথা ; অশ্রদ্ধাসূচক কথা ও কঠোর এবং কর্কশ ভাষা বলা এ সমস্তই বাচনিক মিথ্যাযোগের অন্তর্ভুক্ত।

উপরে বর্ণিত বাচনিক মিথ্যাযোগগুলি মনের সমতা নষ্ট করিবেই। ধরা যাক মিথ্যাকথা বলা। মিথ্যা বলিতে হইলে নিজের অজ্ঞাতসারেও মানুষ নিজের অন্তরের সম অবস্থা হইতে সরিয়া যাইবে। যত বড় অভ্যস্ত মিথ্যাবাদী হউক না কেন মনের মধ্যে কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবেই। সেই প্রতিক্রিয়া ক্রমাগত ঘটিতে থাকিলে সেই মানুষের মন কিছুতেই সত্যকার অর্থে সুস্থ থাকিতে পারে না। সে নিজের ক্ষতি ত করেই, পরিবার এবং সমাজ সবাই তাহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(বর্তমানে মিথ্যা সন্ধানক যন্ত্র বা lie detector আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্পন্দনসকল গ্রাফের মত লিপিবদ্ধ হয়। ঠিক সরলভাবে আঁকা হইতে হইতে মিথ্যাকথা বলিবার মুহূর্তটিতে ঐ গ্রাফের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। তখনই বোঝা যায় ঐ লোকটি ঠিক ঐ সময়ে মিথ্যা কথা বলিতেছে। অত্যন্ত অভ্যস্ত মিথ্যাবাদীর ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় না।) আর একটি বড় উদাহরণ ধরা যাক।

অশ্রদ্ধাসূচক কথাবার্তা বলা :

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, নীতি, আচার, অনুশাসন সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাপূর্ণ কথা বলাকেও আত্রেয় বাক্যের হীনযোগের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ক্রমাগত অশ্রদ্ধাপূর্ণ কথা শুনিতে শুনিতে এবং পরে বলিতে বলিতে মনে যে দৃঢ়মূল বিরূপতার সৃষ্টি হয় তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞানলাভ করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ ধর্ম, নীতি ও শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর হয় না। (বাচনিক মিথ্যা-যোগের এই দিকটির রূপ বর্তমান ভারতবর্ষের সমাজে যতটা প্রকট এতটা পূর্বে কখনও ঘটিয়াছিল কিনা সন্দেহ। ফলে সামগ্রিক ভাবে জ্ঞানের অবক্ষয় বর্ত্তমান সমাজে প্রবল।)

এ ছাড়া কলহপরায়ণ লোক, অযথা নিন্দাকারী, বাচাল লোক সকলকেই এই বাচনিক মিথ্যাযোগের ফলে অল্পবিস্তর মনোবিকারসম্পন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

মনের মিথ্যাযোগের বিষয়

মনের মিথ্যাযোগ কি কি ?

আত্রেয় বলেন—

ভয়শোকক্রোধলোভমোহমানের্ষ্যা মিথ্যাদর্শনাদির্মানসো মিথ্যাযোগঃ।

(চরক সংহিতা, ত্রিস্রৈষণীয় অধ্যায়—শ্লোক ৩৯)

একটি একটি করিয়া কারণ ও কার্যের যোগসূত্র বিশ্লেষণ করা যাক।

ভয় : ইহা ব্যক্তিগত কারণ হইতে পারে আবার পারিপার্শ্বিকতার জন্য সমষ্টিগতভাবে হইতে পারে। যেমন রাষ্ট্রীয় কারণ, প্রাকৃতিক কারণ প্রভৃতি সমষ্টিগত। সাময়িক ভয় অত্যন্ত তীব্র না হইলে মানুষের মনে স্থায়ী ফল দর্শায় না। কিন্তু সেই ভয়ের ফল যদি তীব্র হয় এবং সর্বদাই মনকে পীড়ন করিতে থাকে তবে তাহা হইতে মনোবৈকল্য সম্ভব। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কারণ থাকিলে একটি সমাজের অধিকাংশ মানুষ অল্পবিস্তর মনোবৈকল্যের শিকার হইতে পারে। যুদ্ধের সময় শত্রুদেশ কর্তৃক আক্রান্ত অবস্থায়, সাম্প্রদায়িক হত্যার সময়ে বা রাজ-

সাময়িক এবং দীর্ঘস্থায়ী ভয়

নৈতিক দলগত বিরোধের পরিণামে যে হত্যা নির্যাতন বা সামাজিক নিরাপত্তার অভাব দেখা যায় তাহাতে সমাজের সকল মানুষই ভীরু স্বভাবের হইয়া যায় এবং স্নায়বিক দৌর্বল্যে আক্রান্ত হয়। ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ হিসাবে যে কর্তব্যবোধ মানুষের কাছে আশা করা যায় তাহাও ব্যাহত হয়। এই অবস্থাকেও নিশ্চয়ই মনোবৈকল্য বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়।

শোক ঃ অত্যন্ত প্রিয় আত্মীয় বান্ধব বা ধন-সম্পত্তির ক্ষতির ফলে উন্মাদ না হইলেও মনের অনুরূপ বিকলতা আসিতে পারে।

ক্রোধ ঃ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত হইতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রোধী অল্পকারণেই রাগিয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, মানসিক বিকলতা এবং অসুস্থতা তাহার পক্ষে অনিবার্য। ক্রোধ মনের সমতা নষ্ট করে এবং ক্রমাগত সমতা হারাইতে থাকিলে তাহা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী অসাম্যের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। সমষ্টিগত ভাবে ক্রোধ কোন সাম্প্রদায়িক বা রাষ্ট্রনৈতিক দলভুক্ত

সমষ্টিগত ক্রোধ

ব্যক্তিদের মনে বাসা বাঁধিতে পারে। এই ক্রোধের ফলে অপর সম্প্রদায় বা দলভুক্ত ব্যক্তিদের শত্রু মনে করা সম্ভব এবং ইহার ফল স্বরূপ অপর দলের কোন ব্যক্তি যাহার সহিত কোন পরিচয় পর্যন্ত নাই অথবা পূর্বে সৌহার্দ্য ছিল এমন মানুষকেও হত্যা করিতে পারে। এই সমষ্টিগত সঞ্চিত ক্রোধই তাহাদিগকে জিঘাংসাপরায়ণ করে এবং মনের কোমল বৃত্তিসকল নষ্ট করিয়া দেয়। এই অবস্থাকে অবশ্য মনোবৈকল্য বলা যায়। কারণ সুস্থ মনসম্পন্ন কোন মানুষই এইভাবে জিঘাংসাপরায়ণ এবং হিংস্র হইতে পারে না।

লোভ ঃ অল্পবিস্তর লোভ মানুষ মাত্রেরই থাকে এবং তাহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু লোভের তীব্রতা মনের সুস্থতার হানিকারক। প্রচণ্ড অর্থের লোলুপতায় মানুষ অন্যকে বঞ্চনা করিয়া অর্থলোভ চরিতার্থ

লোভের ব্যাপকতা ও সমাজের স্বাস্থ্যহানি

করে। খাদ্যে ভেজাল মিশায়, সমস্ত সমাজকে প্রবঞ্চিত করে শুধু লোভের বশে। এজন্য তাহার অন্যের প্রতি সহানুভূতি, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, স্বাজাত্যবোধ, মানবতাবোধ—সবই বিসর্জন দিতে হয়। সমাজে এমন মানুষ বেশী সংখ্যায় থাকিলে সমাজ ধ্বংসের পথে যায়। কাজেই ইহাকেও আমরা মনোবৈকল্য আখ্যা দিতে পারি।

ঈর্ষ্যা ঃ অন্যের উন্নতি দেখিয়া অযথা ঈর্ষ্যাপরায়ণ হওয়া মনের মিথ্যা-যোগ। ইহাতে ঈর্ষী'র নিজের মানসিক সমতা নষ্ট হয়। ফলে সে ঈর্ষ্যা-ভাজন ব্যক্তির অনিষ্ট চিন্তা করে বা আর কিছু করিতে না পারিলে নিন্দা করে। (নিন্দা—বাচনিক মিথ্যাযোগ।) অতএব এ-ও এক ধরনের মনো-বৈকল্য বলিয়াই আচার্যগণ নির্দেশ দিয়াছেন। অভিমান মোহ প্রভৃতিও অনুরূপভাবেই মনের মিথ্যাযোগ। লক্ষ্য করিবার মত লক্ষণ হয়ত সৃষ্ট হয় নাই অথচ কিছু কিছু মনোবৈকল্য আছে, এমন মানুষের সংখ্যা সমাজে কম নাই। কার্য থাকিলে তাহার কারণও আছে এবং এই কারণ বিশ্লেষণের পথে আয়ুর্বেদবিদগণের এই বিশ্লেষণ অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত। সমাজে এই সমস্ত হীনযোগের সংখ্যা যত বাড়িবে মনোবৈকল্যযুক্ত মানুষের সংখ্যা তত বাড়িবে।

(আধুনিক মনোবিদ্যায় এই ধরনের মনোবৈকল্যকে Neuroses, Anxiety Neurosis, Obsession Behaviour Symptom প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও এইসব ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ দৈনন্দিন কাজকর্ম, সংসার পালন সবই করে, কিন্তু বহু কাজেই ত্রুটি থাকিয়া যায়।)

মনের স্বস্থতা রক্ষা করা সম্বন্ধে নির্দেশ ঃ

এই সমস্ত অতিযোগ, মিথ্যাযোগ প্রভৃতি বর্জন করিয়া চলিবার জন্য আচার্যগণ অনেক রকমের নিয়ম ও অনুশাসনের উল্লেখ করিয়াছেন। কার্যতঃ ঐগুলি ধর্মবোধভিত্তিক সমাজে চলিবার নির্দেশ ছাড়া অন্য কিছুই নহে। শারীরিক শুচিতা, পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও পরিবেশের উন্নতি সাধন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্বন্ধে দীর্ঘ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি আমাদিগকে স্বভাবতঃই প্রারম্ভিক সূত্রের প্রথম সূত্র স্মরণ করাইয়া দেয়।

যাহা হউক এই সমস্ত অনুষ্ঠান শরীরের উপরে প্রত্যক্ষ এবং মনের উপরে অপ্রত্যক্ষ ক্রিয়া করিয়া ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নতি সাধন করে। তবে মনের উপরে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াশীল নির্দেশও কিছু আছে। তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

কালে হিতমিত মধুরার্থবাদী বশ্যাত্ম ধর্মাত্মা
হেতাবীর্ষুঃ ফলেহনীর্ষুর্নিশ্চিন্তো নির্ভীকো
হ্রীমান্ ধীমান্ মহোৎসাহো দক্ষঃ
ক্ষমাবান্ ধার্মিক আস্তিকো... ইত্যাদি

[চরক সংহিতা, সূত্র স্থান, ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়, ৮ম অধ্যায়—শ্লোক ১১]

সময় বুঝিয়া হিতকর অথচ পরিমিত মধুর বাক্য অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিবে। (অর্থাৎ যে সময়ে যেরূপ কথা বলা শোভন সেইরূপ কথাই বলিবে ।) অন্যকে অযথা বিদ্বেষযুক্ত করিবে না । সংযত হইবে । সকল বিষয়েই অসংযম বহুদিক হইতে ক্ষতি করে । অন্যলোকের উন্নতির কারণ দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিবে কিন্তু ফল দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিবে না । (অর্থাৎ অন্য লোক কিভাবে উন্নতি করিয়াছে তাহার কারণের উপর ঈর্ষ্যা হইলেই সেই পথ অনুসরণ করিবার ইচ্ছা হইবে ।) কিন্তু ফলের উপর ঈর্ষ্যা করিলে মানসিক মিথ্যাযোগে পীড়িত হইবে এবং মনের সুখ নষ্ট হইবে । মহা উৎসাহে নিজের কর্তব্য করিবে । ক্ষমাশীল লজ্জাশীল ধার্মিক আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হইবে ।

সপ্তম অধ্যায়

ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃতি

এক একটি মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য সহজাত প্রবৃত্তি মানসিক প্রবণতা কামনা বাসনার বিভিন্নতা আদর্শবোধ কল্পনাশক্তি ক্রিয়াশীলতা এবং পরিবেশের সহিত মিলাইবার ক্ষমতা প্রভৃতি সব কিছু মিলিয়া যে এক একটি ব্যক্তিসত্তা দেখা যায় তাহাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বলি। সুশ্রুত এই সমষ্টিকে মানবপ্রকৃতি বলিয়াছেন। পৃথিবীতে মানুষ সকলেই সমদেহ সম্পন্ন হয় না বা সমগুণ-সম্পন্ন হয় না। এক এক জন এক এক রকম। এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও কিন্তু দৈহিক অথবা মানসিক দিক দিয়া মানুষের প্রকৃতির শ্রেণীভেদ করা যায়। আয়ুর্বিজ্ঞানীগণ চিকিৎসার সুবিধার জন্য এই শ্রেণীবিন্যাসকে কাজে লাগাইয়াছেন। তাছাড়া সমাজে এই শ্রেণীবিন্যাসের দ্বারা মানুষ চিনিবার অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ও তাহারা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা যেভাবে শ্রেণী বিন্যাস করিয়াছেন তাহার বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রারম্ভিক সূত্রের তিনটি সূত্রই অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের মূলে দৈহিক ভাবে বায়ু, পিত্ত, কফ ও মানসিক ভাবে সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণের প্রভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অবশ্যই সমস্ত বিন্যাসকর্ম অধ্যাত্মবোধের আলোকসম্পাতের প্রভাবেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। আমি এই যে সকল প্রকৃতির আলোচনা করিব আচার্যগণের মতে এ সকলই একটা মোটের উপর দাঁড়-করান শ্রেণী বিন্যাস মাত্র। এই শ্রেণী বিন্যাসই সবটুকু নহে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দেহে ও মনে ত্রিবিধগুণের আনুপাতিক ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিত্বেরও অসংখ্য রকমের বিভেদ হইতে পারে।

ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদের অবলম্বনীয় সূত্র

তেষান্তু ত্রয়াণামপি সত্ত্বানাম্ একৈকস্য
ভেদাগম-পরিসংখ্যেয়ং তরতম-যোগাচ্ছরীর
যোনি-বিশেষেভ্যশ্চান্যোন্যানু-বিধানত্বাচ্চ।

[চরক সংহিতা, শরীর স্থানম্, ৪র্থ অধ্যায়, মহতীগর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়—শ্লোক ৩৫]

সেই ত্রিবিধ সত্ত্বেরই মিশ্রণের ফলে অসংখ্য রকমের প্রকৃতি বা সত্তা কল্পনা করা যায়। কারণ এক একটি গুণের তর বা তম মিশ্রিত হইয়া এবং জন্মদাতা বা জননীর গুণ বা দোষবিশিষ্ট হইয়া প্রকৃতির বহু রকমের ভেদ হইতে পারে।

এখানে তিনি মোটের উপরে যে লক্ষণ বলা হইতেছে তাহা ছাড়াও বহু প্রকারের ব্যক্তিত্ব হইতে পারে এইকথা বলিয়াছেন। জনক জননীর উত্তরাধিকারের কথাও বাদ দেন নাই।

পরিবেশ এবং অন্যান্য কারণবশতঃ ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঃ

তাঁহাদের মতে ব্যক্তিত্ব বা প্রকৃতি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একরকম থাকে না। কারণ সব মানুষের মধ্যেই কম বেশী তিনটি গুণই থাকে। সময়-বিশেষে নানা কারণ বশতঃ এক একটি গুণের প্রাধান্য হইলে অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও প্রকৃতির পরিবর্তন হইতে পারে।

নানা বিধানি তু খলু সত্ত্বানি তানি সর্ব্বানি
এক পুরুষে ভবন্তি। ন চ ভবন্ত্যেক কালম্।
একন্তু প্রায়োঽনুবৃত্ত্যাহ।

[চরক সংহিতা, খুড্ডিকা গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়, শারীর স্থান—শ্লোক ২২]

একই পুরুষের শরীরে তিনগুণ থাকিতে পারে কিন্তু একই কালে তিনটি প্রকট হইয়া ওঠে না অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পরিবেশে বা মানসিকতার ফলে গুণগুলিরও কম বেশী ক্রিয়ার প্রভাবে প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। সঙ্গে সঙ্গে কেহ ভাল, মন্দ বা অধিকতর ভাল হইতে পারে। আবার কেহ মন্দ হইতেও ভাল হইতে পারে।

এইবার আমরা প্রকৃতি ভেদ ও তাহার শ্রেণীবিন্যাস আলোচনা করিব। মহর্ষি আত্রেয় সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিনগুণকে কেন্দ্র করিয়াই মানবগণের প্রকৃতির শ্রেণীবিন্যাস করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মানবসত্ত্বা সাত প্রকার। রাজসসত্তা ছয়প্রকার এবং তামসসত্তা তিন প্রকার। সুশ্রুত ঠিক এইভাবেই ভাগ করিয়াছেন। কিন্তু সুশ্রুত এছাড়াও বায়ু পিত্ত ও কফ এই ত্রয়ীর প্রাধান্য অনুযায়ী আরও সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। বাগভটেও এই সাতটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদে ভিন্ন ভিন্ন মুনিগণ যাহাকে সত্তা বা প্রকৃতি নাম দিয়া

শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, আধুনিক মনোবিদ্যায় ঐগুলিকে Type of Personality বলা হয়। 'টাইপ'-ও এক এক মনোবিদ্ এক এক ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করিয়াছেন। হিপোক্রেটিস, য়ুঙ, যেনেশ, স্প্রানগার, ফ্রয়েড, ক্রেৎসমার, সেলডন প্রভৃতি এইসব টাইপ সম্বন্ধে যেসব মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সমষ্টি ধরিলে দৈহিক দিক এবং মানসিক দিক উভয়কেই আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। এইসব পরীক্ষাতেও প্রমাণিত হইয়াছে মানুষের ব্যক্তিত্বের Type বিচারে দেহের গঠন ও মানসিক ধারা চিন্তার আবেগের বিশ্লেষণ ভোজনপ্রিয়তা, দুঃখ ও বিষণ্ণতা বা প্রভুত্ব কামনা—এগুলির বিচার অবশ্যই প্রয়োজন। আয়ুর্বেদ প্রবক্তৃগণ তাঁহাদের চিন্তা অনুযায়ী (প্রারম্ভিক সূত্র তিনটি অনুসরণে) যে শ্রেণীভেদ করিয়াছেন তাহাতে দৈহিক গঠন বর্ণ চিন্তা আদর্শবাদ সামাজিকতা সবই পরিস্ফুট হইয়াছে।

আধুনিক মনোবিদ্যায় Type of Personality

আত্রেয় বলেন—শুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট সত্ত্বা সাত প্রকার। ধন্বন্তরির শিষ্য সুশ্রুতও তাহাই বলিয়াছেন। এবার তাঁহাদের মত পাশাপাশি রাখিয়া ব্যাখ্যা করা হইবে। এই শ্লোকগুলি চরক সংহিতায় শারীর স্থানে মহতী-গর্ভাবক্রান্তি নামক চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আমি শুধু শ্লোক সংখ্যাই লিখিয়া যাইব। সুশ্রুত সংহিতায় শারীরস্থানে গর্ভব্যাকরণ নামক চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও শুধু শ্লোক সংখ্যা উল্লেখ করিব। শুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতি সাতটি—ব্রহ্ম, ঋষি, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, গন্ধর্ব।

১। ব্রহ্ম—

শুচিং সত্যাভি সন্ধং জিতাত্মানং সং বিভাগিনং।
জ্ঞান-বিজ্ঞান-বচন-প্রতিবচন-সম্পন্নং স্মৃতিমন্তং
কাম-ক্রোধ-লোভ-মান-মোহের্ষ্যা-হর্ষোপেতং
সমং সর্বভূতেষু ব্রাহ্মং বিদ্যাৎ।

[চরক, মহতীগর্ভাবক্রান্ত অধ্যায়—শ্লোক ৪৬।

পবিত্র ভাবযুক্ত, সত্যপথ অনুসরণকারী সমীক্ষাকারী অর্থাৎ কোনও বস্তু বা বিষয়ের দোষগুণ বিশ্লেষণে যিনি সমর্থ, জ্ঞান বিজ্ঞানে যাঁহার অবাধ অধিকার-বাগ্মী এবং প্রতিপক্ষের বিতর্কের উত্তর দানে সমর্থ, তীক্ষ্ন স্মৃতি-শক্তিসম্পন্ন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান, ঈর্ষা প্রভৃতি যাহাকে অভিভূত করে না, সর্বভূতে যিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন—এইরূপ ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম সত্তার অধিকারী বলা হয়।

শৌচমাস্তিক্যমভ্যাসো বেদেষু গুরু পূজনম্ ।
প্রিয়া তিথিত্ব মিজ্যাশ্চ ব্রহ্মকায়স্য লক্ষণং ।

(সুশ্রুত—শ্লোক ৮৯)

শুদ্ধাচার আস্তিক্য বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা গুরুজনাদিতে শ্রদ্ধা অতিথিপরায়ণতা যাগযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে আসক্তি এই সমস্ত ব্রহ্ম কায়ের লক্ষণ ।

২। **আর্ষ সত্ত্বা—**

ইজাধ্যয়ন ব্রত হোম ব্রহ্মচর্য্যমতিথি ব্রত মুপশান্ত মদ-মান-রাগ
দ্বেষ-মোহ-লোভ-রোষং প্রতিবচন বিজ্ঞানোপধারণ শক্তিসম্পন্নমার্ষ্যং
বিদ্যাৎ ।

(চরক—শ্লোক ৪৭)

যজন অধ্যয়ন ব্রত হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানকারী, ব্রহ্মচর্য ও অতিথিপরায়ণ মান, রাগ, দ্বেষ, মোহ, লোভ, ক্রোধ বর্জিত প্রতিবচন বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ধীশক্তি-সম্পন্ন যিনি তিনি আর্ষ (ঋষি) প্রকৃতির নর ।

জ প ব্রত ব্রহ্মচর্য্য হোমাধ্যয়ন সেবিনং
জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্নমৃষি সত্ত্বং নরং বিদুঃ ।

(সুশ্রুত—শ্লোক ৫০)

ব্যাখ্যা চরক সংহিতার মতই ।

৩। **ঐন্দ্র সত্ত্বা বা মাহেন্দ্র কায়—**

ঐশ্বর্যবন্ত মায়ে বাক্যং যজ্বানং শূর মোজস্বিনং
তেজসোপেতমাক্লিষ্ট কর্মাণং দীর্ঘদর্শিনং
ধর্মার্থ কামাভিরতমৈন্দ্রং বিদ্যাৎ ।

(চরক—শ্লোক ৪৮)

ঐশ্বর্যবান এবং এমন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে তাঁহার আদেশ লোকে পালন করিয়া থাকে ; যজ্ঞ অনুষ্ঠানে আগ্রহী ; বীর, তেজস্বী এবং ওজস্বী ; অনিন্দিত কার্যকলাপসম্পন্ন বহু দূরদর্শী যিনি ; ধর্ম, অর্থ, কাম সব কিছুতেই যাঁহার অধিকার ;—এমন মানুষকে ঐন্দ্র সত্ত্বা যুক্ত নর বলা হয় ।

মাহাত্ম্যং শৌর্য্যমাজ্ঞা চ সততং শাস্ত্র বুদ্ধিতা ।
ভৃত্যানাং ভরণঞ্চাপি মাহেন্দ্রং কায়লক্ষণম্ ॥

(সুশ্রুত—শ্লোক ৪৫)

মহানুভবতা শৌর্য বলবত্তা প্রভুত্ব করিবার মত দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, নানারকমের শাস্ত্র যাঁহার অধিকৃত—যিনি ভৃত্য এবং অনুগত ব্যক্তিদের সর্বদা পোষণ করেন তিনিই মাহেন্দ্রকায় লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি।

৪। যাম্য সত্ত্ব—

লেখাস্থবৃত্তং প্রাপ্তকারিণম্ সংহার্য্যমুখানবন্তং
স্মৃতিমন্তমৈশ্বর্য্য লম্ভিনং ব্যপগাত রাগ দ্বেষ
মোহং যাম্যং বিদ্যাৎ।

(চরক—শ্লোক ৪৯)

যিনি কর্তব্যের অতিরিক্ত কোন কার্য করেন না এবং ঠিক সময়মত যেটুকু করা দরকার তাহাই করেন, কর্তব্য বলিয়া মনে করিলে কোন কাজ হইতে যাহাকে কিছুতে নিবৃত্ত করা যায় না—যিনি উন্নতিশীল, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ঐশ্বর্যলাভের উপযুক্ত পাত্র, রাগ দ্বেষ এবং মোহের অধীন যিনি হন না তিনিই যাম্য সত্ত্ববান পুরুষ।

প্রাপ্তকারী দৃঢ়োত্থানো নির্ভয়ঃ স্মৃতিমান্ শুচিঃ
রাগ-মোহ-ভয়-দ্বেষৈ বর্জিতো যাম্য সত্ত্ববান্।

(সুশ্রুত—শ্লোক ৪৯)

কার্য আরম্ভ করিলে বিনা বিলম্বে যিনি কার্য সম্পাদন করেন, কার্য আরম্ভের পূর্বেই যিনি সংকল্প স্থির করিয়া কার্যে অগ্রসর হন, কর্তব্যের পথে যিনি ভয়শূন্য—যাঁহার চিত্তে রাগ মোহ নাই, যিনি সাহসী এবং কাহাকেও বিদ্বেষ করেন না, তিনিই যাম্য সত্ত্বযুক্ত ব্যক্তি।

৫। বারুণ সত্ত্ব—

শূরং শুচিমশুচি দ্বেষিণং
যজ্ঞানমম্ভোবিহাররতিমক্লিষ্ট কর্মাণং
স্থান কোপ প্রসাদং বারুণং বিদ্যাৎ॥

(চরক—শ্লোক ৫০)

বীর, শুচি এবং নিজেই যে শুধু শুচি তাহা নহে, অশুচিতে যাহার বীতরাগ, ধর্মাদি অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক, যিনি জলবিহারে আকাঙ্ক্ষা করেন, অনিন্দ্য-কার্যসম্পন্ন যোগ্য পাত্রে ক্রোধ বা অনুগ্রহ বিতরণ করেন। তাহাকে বারুণ সত্ত্বযুক্ত পুরুষ বলিয়া জানিবে।

শীত সেবা সহিষ্ণুত্বং পৈঙ্গল্যং হরিকেশতা
প্রিয় বাদিত্বমিত্যেতম্বারুণং কায় লক্ষণং।

(সুশ্রুত—শ্লোক ৪৬)

শীতল জল এবং শীতল দ্রব্য সেবন এবং ব্যবহারে যাঁহার আসক্তি, যিনি সর্ব বিষয়ে সহিষ্ণু, যাহার দেহ পিঙ্গল বর্ণ, কেশের বর্ণ সিংহের কেশরের ন্যায় কপিল বর্ণ, যিনি প্রিয়ভাষী, তিনি বারুণ কায়যুক্ত পুরুষ। এই ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য যে চরক সংহিতায় গুণের দিক দিয়া আরও কিছু বলিয়াছেন। আর সুশ্রুত সংহিতায় দেহের বর্ণ ও কেশের বর্ণও উল্লিখিত হইয়াছে।

৬। **কৌবের সত্ত্ব—**

স্থান-মনোপভোগং পরিবার-সম্পন্নং সুখ-বিহারং
ধর্মার্থ-কাম-নিত্যং শুচিং ব্যক্ত কোপ-প্রসাদং
কৌবেরং বিদ্যাৎ।

(চরক—শ্লোক ৫১)

যিনি যে স্থানে সম্মান প্রাপ্য এবং যে স্থানে ভোগের অধিকার এবং যথার্থতা আছে, সেখানেই মাত্র সম্মান গ্রহণ করেন বা ভোগের দিকে অগ্রসর হন। অর্থাৎ অযোগ্যের দেওয়া সম্মান গ্রহণ করেন না বা অনধিকারীর দেওয়া ভোগ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন না।

যিনি পরিবারস্থ সকলের সহিত একাত্ম হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। যিনি জাগতিক বা আধ্যাত্মিক কোনও সুখের কারণকেই বর্জন করিয়া চলেন না। ধর্ম, অর্থ ও কাম সকলই যাঁহাকে সমভাবেই উদ্দীপিত করে। কাহারও প্রতি সন্তোষ বা ক্রোধ কোনটাই যাঁহার অপ্রকাশিত থাকে না অর্থাৎ কাহাকেও অনুগ্রহ করিলেও তাহা ব্যক্ত করেন—ক্রোধ করিলেও তাহা প্রকাশ করিতে বাধা নাই এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষকে কৌবের প্রকৃতি বলা হয়।

মধ্যস্থতা সহিষ্ণুত্বমর্থস্যাগম সঞ্চয়ৌ।
মহাপ্রসব-শক্তিত্বং কৌবেরং কায়লক্ষণম্॥

(সুশ্রুত—শ্লোক ৪৭)

যিনি পরস্পর বিরোধীমত সকলকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন, যিনি সহিষ্ণু অর্থাৎ নানা ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া চলিতে পারেন, যিনি অর্থ উপার্জনে সক্ষম আবার অপব্যয় বর্জন করিয়া সঞ্চয়

করিবার ক্ষমতা রাখেন, যাঁহার মধ্যে বহুমুখী সৃজনী-প্রতিভা দেখা যায় তাঁহাকে কৌবের সত্ত্ব পুরুষ বলা হয়।

৭। গান্ধর্ব সত্ত্বা—

প্রিয় নৃত্যগীত বাদিত্রোল্লাপকং
শ্লোকাখ্যায়িকেতিহাস পুরাণেষু কুশলং
গন্ধ মাল্যানুলেপন বসন স্ত্রী বিহার কাম
নিত্যমনসূয়কং গান্ধর্বং বিদ্যাৎ ।।

(চরক—শ্লোক ৫২)

নৃত্যগীত বাদ্য স্তোত্র গান যাঁহার প্রিয় বিষয়, যিনি কাব্য পুরাণ ইতিহাস আখ্যায়িকা (উপন্যাস) পাঠে যত্নশীল এবং এই সমস্ত বিষয়ে নিপুণ, গন্ধ মাল্য অনুলেপন (প্রসাধন) বিবিধ সাজ সজ্জাতে আসক্ত এবং স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তিপরায়ণ, কাহারও প্রতি ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ পোষণ করেন না—তিনি গান্ধর্ব সত্ত্ব পুরুষ।

গন্ধ মাল্য প্রিয়ত্বঞ্চ নৃত্য বাদিত্র কামিতা
বিহার শীলতা চৈব গান্ধর্বংকায় লক্ষণং

(সুশ্রুত—শ্লোক ৪৮)

সুগন্ধ দ্রব্যাদি মাল্য অলঙ্কারাদি বেশভূষা নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতি যাঁহার প্রিয়, নানা প্রকার বিহার যাঁহার প্রিয় তিনি গান্ধর্ব প্রকৃতির লক্ষণযুক্ত।

এই সাতটি সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। ইহার মধ্যে ব্রাহ্ম সত্ত্ব পুরুষে সত্ত্বগুণের চরম উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

এইবার, রজগুণ প্রধান মানুষের ব্যক্তিত্ব সকল বর্ণনা করিব।

১। অসুর প্রকৃতি ঃ—

শূরং চন্ডমসূয়কং ঐশ্বর্য্যবন্তমৌদরিকং
রৌদ্রমনু ক্রোশক মাত্মপূজকমাসুরং বিদ্যাৎ।

(চরক সংহিতা—শ্লোক ৫৪)

বীর এবং সাহসী, অত্যন্ত ক্রোধী পরের গুণ দেখিলে যে মাৎসর্য প্রকাশ করে যে ঐশ্বর্যবান এবং ঔদারিক (পেটুক), উগ্র এবং নির্দয় সর্বদাই নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং নিজের ভাল ছাড়া অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার দৃষ্টি নাই এমন মানুষকে অসুর প্রকৃতির মানুষ বলা হয়।

ঐশ্বর্য্যবন্তং রৌদ্রঞ্চ শূরং চন্ডমসূয়কম্।
একাশিনং চৌদরিকমাসুরং সপ্তমীদৃশম্ ॥

ঐশ্বর্যবান, ভীষণ স্বভাব, বলশালী ও সাহসী অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ এবং ঈর্ষ্যা প্রকাশকারী, একাকী ভোজনকারী অর্থাৎ কাহাকেও দান না করিয়া ভোজন করে এবং অন্যান্য দ্রব্য ভোগ করে এবং ঔদরিক অর্থাৎ পেটুক স্বভাব বিশিষ্ট লোককে আসুর প্রকৃতির লোক বলা হয়।

২। রাক্ষস সত্ত্ব ঃ—

অমর্ষিণমনুবন্ধ-কোপ-চ্ছিদ্র-প্রহারিণং ক্রূরমাহারাতিমাত্র
রুচিমামিষ-প্রিয়তমং স্বপ্নায়াস-বহুলমীর্ষুং রাক্ষসং বিদ্যাৎ ॥

(চরক সংহিতা—শ্লোক ৫৫)

কোন প্রকার অপমান যে সহ্য করিতে পারে না, একবার রাগ করিলে বহুকাল সেই রাগ পোষণ করে, সামান্য ছিদ্র পাইলেই অপরকে প্রহার করিতে বা আঘাত করিতে যে ইচ্ছুক, অতি মাত্রায় আমিষপ্রিয় এবং আহারপ্রিয়, অত্যন্ত নিদ্রাপ্রিয় এবং পরিশ্রমী এবং অন্যের উন্নতিতে ঈর্ষ্যাবান তাহাকে রাক্ষস সত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

একান্ত গ্রাহিতা রৌদ্রমসূয়া ধর্মবাহ্যতা।
ভৃশমাত্রং তমশ্চাপি রাক্ষসং কায়লক্ষণম্ ॥

(সুশ্রুত—শ্লোক ৫৪)

যাহা কিছুই হউক না কেন—যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে, যে বাহিরে ধর্মভাব দেখায়, অন্তরে ধর্মহীন, অত্যন্ত ক্রোধী এবং অন্যের উপরে ঈর্ষ্যাপরায়ণ, আবার নিদ্রার সময় অপরিমিত নিদ্রা যাহার অভ্যাস তাহাকে রাক্ষস প্রকৃতির মানুষ বলিয়া জানিবে।

৩। পৈশাচ প্রকৃতি ঃ—

মহালসং স্ত্রৈণং স্ত্রীরহস্কামম্ অশুচিং
শুচিদ্বেষিণং ভীরুং ভীষয়িতারং
বিকৃতবিহারাহারশীলং পৈশাচং বিদ্যাৎ।

[চরক সংহিতা—শ্লোক ৫৬]

অত্যন্ত অলস, সর্বদাই স্ত্রীসঙ্গ কামনা করে। নিজে অশুচি ত থাকেই উপরন্তু যে শুচি অবস্থায় থাকে তাহার প্রতি বিদ্বেষ যুক্ত হয়। যে ব্যক্তি

সাহসী লোকের কাছে অগ্রসর হয় না কিন্তু ভীরুকে ভয় দেখায়—এই লোককে পৈশাচ প্রকৃতির মানুষ বলা হয়।

উচ্ছিষ্টাহারতা তৈক্ষ্ণ্যং সাহাপ্রিয়তা তথা
স্ত্রীলোলুপত্বং নৈর্লজ্জ্যং পৈশাচংকায়লক্ষণম্ ।

[সুশ্রুত —শ্লোক ৫৫]

উচ্ছিষ্ট আহার যাহার প্রিয় তীক্ষ্ণরসসকল যে খাইতে আকাঙ্ক্ষা করে, সাহস-প্রিয়তা এবং স্ত্রীসঙ্গলোলুপ এবং লজ্জাহীন যে ব্যক্তি এমন মানুষকে পিশাচ প্রকৃতি বলিয়া জানিবে।

৪। সার্প প্রকৃতি ঃ—

ক্রুদ্ধং শূরং প্রকৃচ্ছন্ন ভীরুং তীক্ষ্ণমায়াসবহুলং মন্ত্র
সুগোচরমাহারবিহারপরং সার্পং বিদ্যাৎ

[চরক—শ্লোক ১৭]

ক্রোধী, বীর, পরিশ্রমী, তীক্ষ্ণস্বভাব, কুটিলবুদ্ধি, অপরের মন্ত্রণা সহজেই বুঝিবার ক্ষমতাযুক্ত এবং যে মানুষ আহার ও বিহারে যথেষ্ট পটু তাহাকে সার্প প্রকৃতি বলা হয়।

তীক্ষ্ণমায়াসিনং ভীরুচণ্ডং মায়ান্বিতন্তথা ।
বিহারাহার চপলং সর্প সত্ত্বং বিদুর্নরম্ ।।

[সুশ্রুত—শ্লোক ৫২]

যে মানুষ প্রকৃতিতে তীক্ষ্ণ, পরিশ্রমী, ক্রোধী অথচ স্বভাবে ভীরু কিন্তু উগ্র। যে মায়াবী অর্থাৎ নিজের প্রকৃতরূপ গোপন করিতে সমর্থ, আহার ও বিহারে চঞ্চল ও কুটিল তাহাকে সর্প প্রকৃতির মানুষ বলা হয়।

৫। প্রেত প্রকৃতি ঃ—

আহারকামমতিদুঃখশীলাচারোপচারমসূয়কমসং বিভাগিন-
মতিলোলুপমকর্মশীলং প্রৈতং বিদ্যাৎ।

[চরক—শ্লোক ৫৮।

যে অত্যন্ত আহারপ্রিয়, যে অতি কষ্টে সাংসারিক আচার উপাচার প্রভৃতি সংগ্রহ করে, অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ সকল কার্যই বিশ্লেষণ বা সমীক্ষায় অক্ষম, সকল বিষয়েই অত্যন্ত লোভী এবং নানারূপ অকর্ম করিতে আগ্রহ ও পটুত্ব দুইই দেখায় তাহাকে প্রেত প্রকৃতির মানুষ বলা হয়।

অসংবিভাগমলসং দুঃখশীলমসুয়কং
লোলুপঞ্চাপ্য দাতারং প্রেতসত্ত্বং বিদুর্নরং।

[সুশ্রুত—শ্লোক ৫৬]

ব্যাখ্যা পূর্বের মতই, তবে দানে অনিচ্ছুক কথাটি যুক্ত।

৬। শাকুন বা পক্ষী প্রকৃতি ঃ—

অনুষক্ত কামমজস্রমাহারবিহার পরম্
অনবস্থিতমমর্ষিণমসঞ্চয়ং শাকুনং বিদ্যাৎ।

[চরক—শ্লোক ৫৯]

অনুষক্তকাম অর্থাৎ যাহার কামনার তৃপ্তি নাই সর্বদাই কামনার প্রভাবে অস্থির হইয়া থাকে, আহার এবং বিচরণে সময় অসময় নাই, চিত্তে স্থৈর্য নাই, ক্রোধী এবং সঞ্চয়ে স্পৃহা বা ক্ষমতা কিছুই নাই—এমন মানবকে পক্ষী প্রকৃতির মানুষ বলা হয়।

প্রবৃদ্ধ কামসেবীচাপ্যজস্রাহার এব চ।
অমর্ষনোঽনবস্থায়ী শাকুণং কায়লক্ষণম্ ॥

[সুশ্রুত—শ্লোক ৫৩]

সর্বদাই কামনার দ্বারা পীড়িত এবং কামনা সকল পূরণে সর্বদাই তৎপর, আহার ও বিচরণের কোনও স্থিরতাও নাই, সময় অসময় জ্ঞান নাই। গোপন-স্বভাব অস্থিরচিত্ত লোককে শাকুন প্রকৃতির মানুষ বলা হয়।

এইবার তামস প্রকৃতির তিনরকম মানবের কথা বলা হইতেছে।

১। পাশব বা পশু সত্ত্ব

নিরাকরিষ্ণুমধমবেশম্ জুগুপ্সিতারম্
আহারবিহারমৈথুনপরং স্বপ্নশীলং পাশবং বিদ্যাৎ।

[চরক—শ্লোক ৬০]

নিরাকরিষ্ণু অর্থাৎ পাছে কোন কাজের ভার নিজের কাঁধে গ্রহণ করিতে হয়—এই ভয়ে সর্বদাই দায় অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান যে করে। অধমবেশ অর্থাৎ শালীনতাহীন পরিচ্ছদ ব্যবহার, কুৎসিত আচরণ, কুৎসিত আহার, কুৎসিত বিলাস ও ব্যসন এবং মৈথুনে অতি আসক্তিপরায়ণ এবং নিদ্রাপ্রিয় নরকে পাশব প্রকৃতিযুক্ত মানুষ বলে।

দুর্মেধস্তবং মন্দতা চ স্বপ্নে মৈথুনিত্যতা।
নিরাকরিষ্ণুতা চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পাশবাগুণাঃ॥

[সুশ্রুত শ্লোক—৫৭]

গভীর জ্ঞানে অনীহা, মেধাহীনতা, নিদ্রাল্পতা, নিত্য মৈথুনে প্রবৃত্তি এবং নিরাকরিষ্ণুতা বা প্রত্যাখ্যানকারিতা—এই সকল পশু প্রকৃতির লক্ষণ।

২। মাৎস্য প্রকৃতি

ভীরুমবুধমাহার লুব্ধমনবস্থিতমনুষক্ত কামক্রোধং সরণশীলং তোয়কামং মাৎস্যং বিদ্যাৎ।

[চরক শ্লোক—৬৬]

ভীরু, বুদ্ধিহীন, অত্যন্ত আহারলোভী, তৃপ্তিহীন কামনায় পীড়িত, ক্রোধশীল, সর্বদাই বিচরণশীল এবং জলকামী মানুষকে মাৎস্য প্রকৃতি বলা হয়।

অনবস্থিততা মৌর্খ্যং ভীরুত্বং সলিলার্থিতা।
পরস্পরাভিমর্দশ্চ মৎস্য সত্ত্বস্য লক্ষণম্॥

অস্থিরচিত্ততা, চঞ্চলতা, মূর্খতা, ভীরুতা, স্বজাতি, স্বশ্রেণী বা কুটুম্ব আত্মীয়গণকে পীড়ন করা, (মাৎস্যন্যায়) এবং জলপ্রিয়তা এই সমস্তই মৎস্য সত্ত্বের লক্ষণ।

৩। বানস্পত্য অথবা বনস্পতি প্রকৃতি

অলসং কেবলমভিনিবিষ্টমাহারে সর্ববুদ্ধ্যঙ্গহীনং বানস্পত্যং বিদ্যাৎ॥

[চরক শ্লোক—৬৩]

অলস, একমাত্র ভোজন সম্বন্ধেই জ্ঞান আছে, অন্যান্য বিষয়ে বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে বানস্পত্য অর্থাৎ বৃক্ষসত্ত্ব পুরুষ বলা হয়।

একস্থানরতির্নিত্যমাহারে কেবলে রতঃ।
বানস্পত্যো নরঃ সত্ত্বধর্মকামার্থবর্জিতঃ॥

[সুশ্রুত শ্লোক—৫৯]

সর্বদাই একস্থানে অবস্থান, কেবল আহারে আসক্তি, সত্ত্ব ধর্ম অর্থ ইত্যাদি বিষয়ে বুদ্ধিও নাই, আসক্তিও নাই—এইরূপ মানুষকে বানস্পত্য মানব বলা হয়।

(বানস্পত্য প্রকৃতির মানুষকে আধুনিক মনোবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যা অনুযায়ী Imbecile-এর সহিত মিলান যায়। Imbecility-র কারণ স্বরূপ আধুনিক শাস্ত্রে Hormone বিশেষ ভাবে Thyroid গ্রন্থির Hormone-এর অভাব বলিয়া বলা হয়।)

আত্রেয় বলেন—বাস্তব জগতে ঠিক ঠিক এক একটি প্রকৃতির মানুষ কদাচিৎই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকৃতিগুলির মিশ্রণের দ্বারা মানব প্রকৃতিতেও অসংখ্য ভেদ কল্পনা করা যায়। একই মানুষের মধ্যে তিনটি গুণেরই কিছু কিছু অংশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব গঠিত করিতে পারে। সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের প্রাধান্য অনুযায়ী এক এক রকমের ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। এইসব গুণগুলির আনুপাতিক উপস্থিতির জন্যই সত্ত্বগুণ প্রধান বা রজগুণ প্রধান বা তমগুণ প্রধান প্রকৃতির মানুষ দেখা যায়।

মোটের উপর এক একটি গুণের প্রাধান্যে মানুষের প্রকৃতি এক রকমের হয়, আবার অপরগুলির উপস্থিতির জন্য সেগুলির গুণ বা দোষ অল্পবিস্তর দেখা যাইতে পারে।

> ইত্যপরিসংখ্যেয় ভেদানাং খলুত্রয়ানামপি সত্ত্বানাং ভেদৈকদেশো-
> ব্যাখ্যাতঃ।

[চরক সংহিতা, শ্লোক—৬৫]

ত্রিবিধ সত্ত্বের অসংখ্য ভেদ দেখা গেলেও ঐ সকল ভেদের একদেশ মাত্র কথিত হইল। বাস্তবিক এইরূপ একটি রূপরেখার বর্ণনা ছাড়া অসংখ্য প্রকৃতির অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিত্বের বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। এই রূপরেখার সাহায্যেই পাঠক মানুষের প্রকৃতি ভেদে সমর্থ হইবেন। এই যে প্রকৃতিভেদ বর্ণিত হইল এইগুলি সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া বলা হইল। এইগুলি সবই মনের গুণ। সেজন্য এই বর্ণিত প্রকৃতিতে প্রায় মানসিক গঠনের দিক দিয়াই বলা হইয়াছে।

বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রভাবে দেহ ও মনের গঠন ভিন্ন হয়

বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটি শরীরের দোষ। কিন্তু ইহারা তিন স্তম্ভবিশিষ্ট (শরীর, মন ও আত্মা) এই পুরুষের আশ্রয় স্বরূপ। সুতরাং বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রাধান্য অনুযায়ী পুরুষের প্রকৃতি বা ব্যক্তিত্ব গঠিত হইতে পারে কিনা এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হইতে পারে। তবে যেহেতু বায়ু, পিত্ত ও কফ, শরীর ও মন উভয়কেই ধারণ করে সেহেতু বাতজ-প্রকৃতি পিত্তজ-প্রকৃতি ও কফজ-প্রকৃতির পুরুষকে বর্ণনার সময়

আচার্যগণ এক একটি প্রকৃতিতে তাহার শরীর গঠনাদি কেমন হইবে যেমন বর্ণনা করিয়াছেন তেমনই মনের গঠন চরিত্রের বিভিন্নতাও সমানভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। সুশ্রুত সংহিতা এবং বাগভট কৃত 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' নামক গ্রন্থে সাতটি প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে। (১) বাতজ প্রকৃতি (২) পিত্তজ (৩) শ্লেষ্মজ (৪) বাতপিত্ত (৫) বাতশ্লেষ্ম (৬) পিত্তশ্লেষ্মা (৭) সন্নিপাত (ত্রি দোষজ) প্রকৃতি। সুশ্রুত বলেন—গর্ভ স্থাপন এবং শুক্র ও আর্তব (অর্থাৎ যাহার মিলনে গর্ভ উৎপন্ন হয়) মিলন সময়ে মাতা ও পিতার মধ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে যে দোষ প্রবল হয় সন্তান ও সেই সেই দোষ লইয়া জন্মগ্রহণ করে।

সপ্ত প্রকৃতয়ো ভবন্তি। দোষৈঃ পৃথক্ দ্বিশঃ সমস্তৈশ্চ।
শুক্র শোণিত সংযোগে যো ভবেদ্দোষ উৎকটঃ।
প্রকৃতির্জায়তে তেন তস্যামে লক্ষণং শৃণু॥

(সুশ্রুত সংহিতা, ঐ অধ্যায় শ্লোক ৩৯)

শ্রীডল্লন তাঁহার নিবন্ধ সংগ্রহে ঐ 'উৎকট' কথাটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বভাবতঃই "উৎকট" এই শব্দটি শুনিলেই মনে সন্দেহ জাগে যে ইহা ব্যাধি কিনা। ডল্লন বলেন, না ব্যাধি নহে। বায়ু, পিত্ত, কফই তো শরীরের আশ্রয়। দেহীর দেহে কোন না কোন দোষের প্রাধান্য থাকিবেই। শুক্র ও আর্তবের মিলনকালেও পিতামাতার দেহেও কোনও কোনও দোষের প্রাধান্য আসিবেই। কাজেই সেই সেই দোষ অনুসারে শরীর ও প্রকৃতি গঠিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক অর্থাৎ বিকৃতি হইলে ত গর্ভ নষ্ট হইয়াই যাইত।

যো ভবেদ্দোষ উৎকট ঃ ইতি স্বভাব স্থিতো ন প্রকুপিতঃ। তত্র প্রাকৃতাঃ সপ্তবিধাঃ প্রকৃতে র্হেতুভূতাঃ শরীরৈক জন্মানঃ বৈকৃতাশ্চগর্ভব্যাঘাতকরাঃ।

(শ্রীডল্লন বিরচিত নিবন্ধ সংগ্রহ)

এই বিশ্লেষণে পিতামাতার নিকট হইতে শরীর ও মন গঠনের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে। যে কোন দোষের প্রাবল্য মানুষের শরীর ও প্রকৃতি গঠনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, সেইরূপ জন্মান্তর জাত প্রবৃত্তি এবং মানসিকতা মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরূপে তাহার ব্যক্তিত্ব গঠন করে। এ সম্বন্ধে মনের ক্রমবিকাশ অধ্যায়ে সুশ্রুত সংহিতার শারীর স্থান গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়ের শ্লোক ৬৭ এবং চরক সংহিতার শারীর স্থানের মহতী গর্ভাবক্রান্তি

অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছি। এ সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এবার ত্রি-দোষজাত প্রকৃতিগুলির আলোচনা করিব।

বাতজ প্রকৃতি

তত্র জাগরূকঃ শীতদ্বেষী দুর্ভগঃ স্তেনো
মৎসর্য্যনার্য্যো গান্ধর্ব চিত্তঃ
স্ফুটিতকর চরণোঽতি রুক্ষশ্মশ্রুনখকেশঃ
ক্রোধী দন্তনখখাদী চ ভবতি।
অধৃতিরদৃঢ় সৌহৃদঃ কৃতঘ্নঃ
কৃশ পরুষো ধমনী ততঃ প্রলাপী।
দ্রুতগতিরটনোঽনবস্থিতাত্মা
বিয়দপি গচ্ছতি সম্ভ্রমেন সুপ্তঃ
অব্যবস্থিতমতিশ্চল দৃষ্টির্মন্দ রত্নধন সঞ্চয় মিত্রঃ।
কিঞ্চিদেব বিলপত্য নিবদ্ধং মারুত প্রকৃতিরেষ মনুষ্যঃ
বাতিকাশ্চাজ গোমায়ু শশাখুষ্ট্রা শুনান্তথা
গৃধ্রকাক খরাদীনামনুকৈঃ কীর্ত্তিতা নরাঃ।

(সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান, গর্ভ ব্যাকরণ অধ্যায়—চতুর্থ অধ্যায় শ্লোক ৪০)

ব্যাখ্যায় শরীর এবং স্বভাব পৃথকভাবে বলিলে বুঝিবার সুবিধা হইবে।

শারীরিক বিশেষত্ব :—হাত পা ফাটা ফাটা, খসখসে রুক্ষবর্ণের চুল-দাড়ি এবং নখ। নখ কামড়ান অভ্যাস, দাঁত কিড়মিড় করা স্বভাব, দেহের শিরাগুলি দেখা যায়, প্রায়ই প্রিয়দর্শন হয় না। কৃশ এবং রুক্ষ চেহারা বিশিষ্ট হয়।

স্বভাব :—বাতজ প্রকৃতিতে মানুষের ঘুম কম হয়। শীতদ্বেষী অর্থাৎ শীতল দ্রব্য অপ্রিয় হয়। চুরি করা (স্তেনো) স্বভাবযুক্ত হয়। পরের গুণে অসহিষ্ণুতা দেখায় (মৎসরী), অনার্য স্বভাব অর্থাৎ সভ্য ও শান্ত গুণ-শালী হয় না। নাচ গান প্রিয় হয়। ধৈর্যবিহীন (অধৃতি), মিত্রতায় অবিশ্বাসী এবং কৃতঘ্ন স্বভাবের হয়। কর্কশ কথা বার্তা বলে এবং বাচালতা প্রকাশ করে। অত্যন্ত দ্রুত কথা বলা, দ্রুত চলার অভ্যাস, চঞ্চল দৃষ্টি, চঞ্চল মনযুক্ত হয়। ধনরত্ন সঞ্চয়ে ইচ্ছা থাকে না তেমনই মিত্রলাভে আগ্রহ থাকে না, স্বপ্নে শূন্যমার্গে বিচরণ করা দেখে। ছাগল, শৃগাল, শশক, ইঁদুর, উট, কুকুর,

শকুনি, কাক, গর্দভ প্রভৃতি জন্তুর মিলিত স্বভাব ইহাদের মধ্যে দেখা যায়।

বাগভট বলেন—

বিভুত্বাদাশুকারিত্বাদ্বলিত্বাদল্প কোপনাৎ।
স্বাতন্ত্র্যাদ্বহু রোগত্বাদ্দোষাণাং প্রবলোঽনিলঃ॥
প্রায়স্ত এব পবনাধ্যুষিতা মনুষ্যাঃ দোষাত্মকাঃ স্ফুটিত ধূসর কেশগাত্রাঃ।
শীতাদ্বিষশ্চল ধৃতি স্মৃতি বুদ্ধি চেষ্টাঃ সৌহার্দ্য দৃষ্টিগতয়োঽতি বহুপ্রলাপাঃ॥
অল্পপিত্তবলজীবিত নিদ্রাসন্নশক্ত বহুর্জর্র বাচঃ।
নাস্তিকা বহুভুজঃ সবিলাসা গীতহাস্য মৃগয়াকেলিলোলাঃ।
মধুরাম্লকটুষ্ণ সাত্ম্যকাঙ্ক্ষাঃ কৃশদীর্ঘাকৃতয়ঃ সশব্দযানাঃ।
ন দৃঢ়া ন জিতেন্দ্রিয়া ন চর্য্যা ন চ কান্তাদয়িতা বহুপ্রজা বা।
নেত্রাণিচৈষাং খরধূসরাণি বৃত্তান্যচারূণি মৃতোপমাণি।
উন্মীলিতানীব ভবন্তি সুপ্তে শৈলদ্রুমান্তে গগনং প্রয়ান্তি।
অধন্যা মৎসরাধ্মাতাঃ স্তেনাঃ প্রোদ্বদ্ধপিণ্ডিকাঃ
শ্ব শৃগালোষ্ট্রগৃধ্রাখু কাকোনূকাশ্চবাতিকাঃ॥

(ভাবপ্রকাশ, তৃতীয় প্রকরণ ৫৫-৭৬ শ্লোক [বাগভটে উক্ত])

বাগভটও সুশ্রুতের মত একই প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন—কয়েকটি বিশেষত্ব আরও যোগ করিয়াছেন। সেইগুলিই মাত্র বলিতেছি। প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ক্রোধপরায়ণ এবং বায়ুকুপিত হইলে যে সমস্ত রোগ জন্মে তাহার প্রবণতাযুক্ত। মনের স্থৈর্য নাই। ইন্দ্রিয় সংযমের ইচ্ছাও থাকে না, ক্ষমতাও থাকে না। স্ত্রীর প্রিয় হইবার সামর্থ্য কম থাকে, প্রজনন ক্ষমতাও কম। পরিবারস্থ সকলের সহিত একত্রে থাকিবার ইচ্ছা থাকে না। চোখ ধূসর গোলাকার—মৃতের চোখের মত প্রভাহীন। নিদ্রিতাবস্থাতেও চোখ খোলা থাকে। স্বপ্নে শুধু আকাশ নয়, উচ্চবৃক্ষে বা পর্বত চূড়ায় ওঠে। অন্যান্য বিবরণ সুশ্রুতের ন্যায়।

পিত্তজ প্রকৃতি ঃ—

স্বেদনোদুর্গন্ধঃ পীতশিথিলাঙ্গস্তাম্রনখনয়ন
তালুজিহ্বৌষ্ঠ পাণিপাদতলো দুর্ভগো

বলীপলিত খালিত্যজুষ্টো বহুভুগুষ্ণদ্বেষী
ক্ষিপ্রকোপ প্রসাদো মধ্যমবলো মধ্যমায়ুশ্চ
ভবতি। মেধাবী নিপুণমতি র্বিগৃহ্যবক্তা
তেজস্বী সমিতিষু দুর্ণিবার বীর্যাঃ।
সুপ্তঃ সন্ কনকপলাশ কর্ণিকারান্
সম্পশ্যেদপি চ হুতাশ বিদ্যুদুলকাঃ।
ন ভয়াৎ প্রণমেদন তেম্ব মৃদুঃ
প্রণতেম্বপি সান্ত্বনদান রুচিঃ।
ভবতীহ সদা ব্যথিতাস্যগতিঃ স ভবেদিহ
পিত্তকৃত প্রকৃতিঃ। ভুজঙ্গোলুক
গন্ধর্ব যক্ষ মার্জার বানরৈঃ। ব্যাঘ্রক্ষ
নকুলানুকৈঃ পৈত্তিকাস্তু নরা স্মৃতাঃ।

(সুশ্রুত সংহিতা, ঐ ঐ শ্লোক ৪১)

শারীরিক : বেশী ঘাম হয় সেজন্য শরীরে দুর্গন্ধ হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল ঢিলা ঢিলা ভাব—পীতবর্ণ। নখ, চক্ষু, জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, হস্ত ও পদতল তামার মত বর্ণ বিশিষ্ট, শ্রীহীন বলি রেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল। অকালে কেশ পক্কতা হয় এবং টাক পড়ে (খালিত্য)। প্রায়ই মুখের রোগে ভোগে।

প্রকৃতি : বহুভোজী, উষ্ণ দ্রব্যে অপ্রিয়তা, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ক্রোধ জন্মে আবার অল্পতেই শান্ত হয়। খুব দুর্বলও নয় আবার বলবানও নয় মধ্যবল এবং মধ্যম রকমের আয়ুবিশিষ্ট হয়। মেধাবী এবং বহুরকমের বুদ্ধিতে নিপুণ হয়, স্পষ্ট বক্তা হয়। লোকের সম্মুখেই অপ্রিয় সত্য কথা বলে। তেজস্বী স্বভাব হয়, যুদ্ধে দুর্নিবার হয়, ভীরুতা কখনই দেখা যায় না। উগ্র প্রকৃতি লোকের নিকট ভয়ে নত হয় না। শরণাগতলোকের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। লোকের দুঃখে সান্ত্বনা দিতে নিপুণ হয়।

স্বপ্নে স্বর্ণ, পলাশফুল, কর্ণিকারফুল, অগ্নি, বিদ্যুৎ, উল্কা প্রভৃতি দেখে। সাপ, পেঁচা, গন্ধর্ব, যক্ষ, বিড়াল, বানর, বাঘ, ভালুক ও বেজী এই সকলের মিশ্রণে যে স্বভাব হইতে পারে পিত্তজ প্রকৃতিতে মানুষের সেই স্বভাব হয়।

বাগ্‌ভট বলেন (অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে)

পিত্তংবহ্নির্বহ্নিজং বা তদস্মাৎ পিত্তোদ্রিক্তস্তীবতৃষ্ণো বুভুক্ষুঃ
গৌরোষ্ণাঙ্গস্তাম্রহস্তাঙ্ঘ্রি চক্ষুঃ শূরোমানীপিঙ্গকেশোহল্প রোমা।
দয়িতমাল্যবিলেপন মণ্ডনঃ সুচরিতঃ শুচিরাশ্রিত বৎসলঃ।
বিভব সাহসবুদ্ধিবলান্বিতো ভবতি ভীষুগতির্দ্বিষতামপি
মেধাবী প্রশিথিল সন্ধিবন্ধ মাংসো নারীনামনভিমতোহল্প-
শুক্রকামঃ।
আবাসপলিতব্যঙ্গ নীলিকানাং ভুঙ্‌ক্তেহন্নং মধুরকষায়তিক্তশীতম
ধর্মদ্বেষী স্বেদনঃ পূতিগন্ধি ভূর্য্যুর্চ্চার ক্রোধপানাশনের্ষ্যঃ।
সুপ্তঃ পশ্যেৎ কর্ণিকারান্ পলাশান্ দিগ্‌দাহোল্কাবিদ্যুদর্কানিলাংশ্চ
তনূনি পিঙ্গানি চলানি চৈষাং তন্বল্প পক্ষ্মাণি হিমপ্রিয়াণি।
ক্রোধেন মদ্যেন রবেশ্চ ভাসা রাগং ব্রজন্ত্যাশু বিলোচনানি
মধ্যায়ুষো মধ্যবলাঃ পণ্ডিতাঃ ক্লেশভীরবঃ ব্যাঘ্রর্ক্ষকপিমার্জার
বৃকানূকাশ্চপৈত্তিকা।

সুশ্রুত যাহা বলিয়াছেন তাহার সবই এই বর্ণনাতেও আছে। উপরন্তু বাগভট যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—পিঙ্গল কেশ, অল্প লোম বিশিষ্ট, মালা, প্রসাধন এবং স্ত্রীতে আসক্তি থাকে। সুচরিত্র ও আশ্রিতবৎসল হয়। অজীর্ণ ব্যাধিতে ভোগে সেজন্য দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর মল নিঃসরণ করে। চোখের পাতায় লোম অল্প হয় এবং পাতলা হয়। চঞ্চল চক্ষু, ক্রোধ, মদ্যপান বা সূর্যের তাপে ঈষৎ আরক্ত হইলে যেমন হয় তেমনই আরক্ত থাকে।

কফজ প্রকৃতি :—

দূর্বেন্দীবরনিস্ত্রিংশ শার্দ্রারিষ্ট শরকাণ্ডাণাম্ অন্যতমবর্ণঃ
সুভগঃ প্রিয়দর্শনো মধুর প্রিয়ঃ কৃতজ্ঞো ধৃতিমান্
সহিষ্ণুরলোলুপো বলবাং শ্চিরগ্রাহীদৃঢ়বৈরশ্চ ভবতি
শুক্লাক্ষঃ স্থিরকুটিলাতিনীল কেশো—
লক্ষ্মীবান্ জলদমৃদঙ্গ সিংহ ঘোষঃ
সুপ্তঃ সন্ সকমল হংস চক্রবাকান্
সম্পশ্যেদপি চ জলাশয়ান্ মনোজ্ঞান্।
রক্তান্তনেত্রঃ সুবিভক্তগাত্রঃ স্নিগ্ধচ্ছবিঃ সত্ত্বগুণোপপন্নঃ
ক্লেশক্ষমো মানয়িতা গুরুণাং জ্ঞেয়ো

বলাস প্রকৃতি র্মনুষ্যঃ। দৃঢ় শাস্ত্রমতিঃ
স্থির মিত্র ধনঃ পরিগণ্য চিরাৎ
প্রদদাতি বহু।
পরিনিশ্চিত বাক্যপদঃ সততং গুরু মানকরশ্চ
ভবেৎ স সদা।
ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রবরুণৈঃ সিংহাশ্বগজ
গো বৃষৈঃ
তাক্ষ্য-হংসসমানূকাঃ শ্লেষ্ম প্রকৃতয়ো নরাঃ।

(সুশ্রুত সংহিতা, ঐ ঐ শ্লোক ৪২)

শারীরিক ঃ গাত্রবর্ণ দূর্বানীলোৎপল খড়্গ (মার্জিত লৌহ) আদা অরিষ্ট নামক ফল অথবা শরকাণ্ড—এই সকলের যে কোনটির মত। শ্রীমান, প্রিয় দর্শন, চোখের রং সাদা কিন্তু অপাঙ্গ বা চোখের কোণে একটু লাল আভা। সুগঠিত দেহ, কোঁকড়ান কেশদাম কৃষ্ণবর্ণ।

স্বভাব ঃ মধুর দ্রব্য প্রিয়, ধৈর্যশীল, উপকারীর উপকার করা যাহার স্বভাব। সহিষ্ণু, নির্লোভ, বলবান—কিছু বুঝিলে তাহা দীর্ঘকাল মনে রাখিবার ক্ষমতা বিশিষ্ট। দৃঢ় বৈর অর্থাৎ শত্রুতা সাধনের মন হইলে তাহা মনে সাহস রাখিয়াই করিতে পারে। স্থিরবুদ্ধি, লক্ষ্মীমন্ত। মেঘ মৃদঙ্গ বা সিংহের মত গম্ভীর কণ্ঠস্বরযুক্ত। গুরুজন বা মান্যবর ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠা নাই। শাস্ত্রাদি বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানযুক্ত, ধনবান, দানশীল এবং সকল সময়ে নিশ্চিত বাক্যপ্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত। স্বপ্নে পদ্ম, হংস বা জলচর পক্ষীগণ সমাকীর্ণ জলাশয় দর্শন করে। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বরুণ, সিংহ, অশ্ব, গজ, বৃষ, গরুড়, পক্ষী ও হংস ইত্যাদির মিশ্রিত স্বভাব ও সাদৃশ্য যাহাতে থাকে তাহাকে বলাস প্রকৃতি বা কফজ প্রকৃতিযুক্ত মানুষ বলা যায়।

বাগভট বলেন—

শ্লেষ্মা সোমঃ শ্লেষ্মল স্তেন সৌম্যো গূঢ় স্নিগ্ধ-শ্লিষ্ট সন্ধ্যাস্থিমাংসঃ।
ক্ষুৎ তৃট্ দুঃখ ক্লেশ ঘর্মৈরতপ্তো বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সাত্বিকঃ সত্যসন্ধঃ।।
প্রিয়ঙ্গুদূর্বাশরকাণ্ডদর্ভগোরোচনা পদ্ম সুবর্ণবর্ণঃ।
প্রলম্ববাহুঃপৃথুপীন বক্ষা মহাললাটো ঘননীল কেশঃ।।
মৃদ্বঙ্গঃ সম সুবিভক্ত চারুদেহো বহেবাজোরতিরস শুক্রপুত্রভৃত্যঃ।

ধর্মাত্মা বদতি ন নিষ্ঠুরঞ্চ যাতু প্রচ্ছন্নং বহতি দৃঢ়ং চিরঞ্চ বৈরম্ ।।
সমদাম্বিরদেন্দ্রতুল্য যানো জলদাম্ভোধিমৃদঙ্গশঙ্খঘোষঃ ।
স্মৃতিমানভি যোগবান্ বিনীতো ন চ বাল্যেঽপ্যতিরোদনো ন লোলং ।।
তিক্তং কষায়ং কটুকোষ্ণ রূক্ষমল্পং স ভুঙ্ক্তে বলবাংস্তথাপি
রক্তান্তসুস্নিগ্ধ বিশালদীর্ঘসুব্যক্তশুক্লাসিত পক্ষ্মলাক্ষঃ ।।
অল্পাহার ক্রোধ পানাশনের্ষ্যঃপ্রজ্ঞা চিত্তো দীর্ঘসূত্রীবদান্যঃ ।
হৃদ গম্ভীর স্থূলবক্ষাঃ ক্ষমাবান্ নিদ্রালুশ্চালুস্থবৃত্তঃ কৃতজ্ঞঃ ।।
ঋজুর্বিপশ্চিৎ সুভগঃ সলজ্জো ভক্তো গুরূণাং স্থির সৌহৃদশ্চ ।
স্বপ্নে সপদ্মান সবিহঙ্গমালাং স্তোয়াশয়ান্ পশ্যতি তোয়দাংশ্চ ।।
বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবরুণতার্ক্ষ্য হংসগজাধিপৈঃ শ্লেষ্ম প্রকৃতয় স্তুল্যাস্তথা
সিংহাশ্বগোবৃষৈঃ ।।

(ভাবপ্রকাশ, তৃতীয় প্রকরণ)

শ্লেষ্ম প্রকৃতিতে সুশ্রুত সংহিতা অপেক্ষা কিছু বেশী বৈশিষ্ট্য যোগ করা হইয়াছে। যেমন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, পরিশ্রম সব কিছুতেই অতপ্ত অর্থাৎ অভিভূত নহে। বাল্যকালেও বেশী রোদনশীল হয় না, আহার-লোলুপ হয় না। অল্প আহারেও বলক্ষয় হয় না। হাত, পা, বুক, মাংসল সুসমঞ্জস দেহ—রতিরস উল্লাসী—বহু পুত্রের জনক অর্থাৎ প্রজনন ক্ষমতা বেশী থাকে। কণ্ঠস্বর গম্ভীর—মৃদঙ্গ প্রভৃতির সহিত সমুদ্র গর্জনের ন্যায় উপমা যোগ হইয়াছে। অন্যান্য লক্ষণ কিছু ভাষার তারতম্য ছাড়া প্রায় একরকমই। এইরূপ এক একটি প্রকৃতির লক্ষণ বর্ণনার পর মিশ্রভাবের প্রকৃতি কল্পনা করিতে বলা হইয়াছে। যেমন—বাত-পিত্ত, বাত-শ্লেষ্মা, পিত্ত-শ্লেষ্মা অথবা ত্রিদোষের সমন্বয়ে গঠিত প্রকৃতির কথা কল্পনা করিতে বলা হইয়াছে।

দ্বয়োর্ধা তিসৃনাং বাপি প্রকৃতীনাস্তুলক্ষণৈঃ ।
জ্ঞাত্বা সংসর্গজা বৈদ্যঃ প্রকৃতীরভিনির্দিশেৎ ।

(সুশ্রুত সংহিতা, ঐ শ্লোক ৪৩)

এই সমস্ত লক্ষণ যাহা বলা হইল ইহা কোনও রোগের লক্ষণ নহে। যাহাদের বর্ণনা করা হইল তাহারাও রোগী নহে। তাহারা সুস্থ মানুষ এবং এই সব দোষ কুপিত না হইয়াই এইরূপ প্রকৃতি গঠন করে। (বর্ত্তমান বিজ্ঞানে প্রমাণিত হইয়াছে দেহের গঠন আয়তন, বৃদ্ধি, লোমশতা বা বিরল

কেশতা প্রভৃতি অন্তঃস্রাবীগ্রন্থি অর্থাৎ Endocrine glands-এর নিঃসারিত hormone সমূহের ক্রিয়ার ফল। আবার স্বভাবও অনুরূপ ভাবে উহাদের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। বুদ্ধিমত্তা, ক্রোধপ্রবণতা, স্থৈর্য, কর্মদক্ষতা প্রভৃতিও অনেকখানিই Hormone প্রভাবে প্রভাবিত। বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতির বর্ণনায় যাহা পাওয়া যায় তাহাতে ঐ Hormone সকলের ক্রিয়ার আনুপাতিক ও মিশ্রফলের কথাই স্মরণ করা যায়।)

অসংখ্য মানুষের যেমন দৈহিক রূপও অসংখ্য তেমনই ব্যক্তিত্বের প্রকার-ভেদও অসংখ্য। কিন্তু স্তর বিন্যাসের একটি পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণী বিন্যাসের পর অসংখ্য মিশ্ররূপ কল্পনা করা কষ্টসাধ্য নহে। সেইজন্যই এই শ্রেণী বিন্যাস। একই মানুষের মধ্যে লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি যেমন তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিতে পারে অন্য সত্তার অংশ তাহার মধ্যে থাকিয়া তাহাকে জ্ঞানলিপ্সা, উদারতা ও পাণ্ডিত্যও দিতে পারে। একই মানুষের মধ্যে বহু বিপরীতধর্মী গুণ বা দোষ থাকিতে পারে।

মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—বিপরীত গুণগুলি একই সময়ে একই মানুষে আত্মপ্রকাশ করে না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষের মিশ্র-সত্তাগুলি প্রকট হইয়া মানুষকে সুকর্মে বা কুকর্মে লিপ্ত করিতে পারে।

এই অধ্যায়ে আচার্যগণের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উল্লিখিত হইল। তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক প্রয়োগের আলোচনাই এ অধ্যায়ের বিশেষত্ব।

অষ্টম অধ্যায়

স্মৃতি, প্রত্যয় এবং প্রত্যয়ের উদাহরণ সকল

স্মৃতি কি? অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়কে মনের মধ্যে সংরক্ষণ করা এবং সংরক্ষিত বিষয়গুলিকে প্রয়োজনমত পুনরুদ্রেক করাকে স্মৃতি বলে। মানুষের জীবনযাত্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে স্মৃতি তাহাকে পথ নির্দেশ করে। অতীতের অভিজ্ঞতা মনে সংরক্ষিত হয় এবং সেই বিষয়গুলির পুনরুদ্রেক হয় বলিয়াই মানুষ সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের কর্তব্য নির্দ্ধারিণ করে।

এই স্মৃতি কিভাবে উৎপন্ন হয় এ বিষয়ে মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—

বক্ষ্যন্তে কারণান্যষ্টৌ স্মৃতির্যৈরুপজায়তে।
নিমিত্ত রূপ গ্রহণাৎ সাদৃশ্যাৎ স বিপর্য্যয়াৎ॥
সত্ত্বানুবন্ধাদভ্যাসাজজ্ঞানযোগাৎ পুনঃ শ্রুতাৎ।
দৃষ্ট শ্রুতানুভূতানাং স্মরণাৎ স্মৃতিরুচ্যতে।

(চরক সংহিতা, শারীর স্থান, প্রথম অধ্যায়, কতিধাপুরুষীয় অধ্যায়—শ্লোক ৬১)

দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত দ্রব্য বা বিষয় সকলের কারণ নিরূপণ-স্বরূপ নিরূপণ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য বিবেচনা। সত্ত্বানুবন্ধ অর্থাৎ ঐ বিষয়গুলি পরস্পরের সহিত কিভাবে যুক্ত তাহার বিচার, অভ্যাস জ্ঞানযোগ এবং বিষয়গুলির পুনঃ শ্রবণ হইতে যে স্মরণ তাহাকে স্মৃতি বলে। স্মৃতি উৎপন্ন হইবার এই আটটি কারণ। এই কারণগুলির বিচার বিশ্লেষণ করিলে আমরা কি পাই তাহা দেখা যাক। স্মৃতি উৎপন্ন হইবার মূল বীজ হইল দৃষ্ট, শ্রুত এবং অনুভূত বিষয় বা দ্রব্যগণ। কিন্তু এই বিষয়গুলি কি মানুষের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ হইতে হইবে? আত্রেয় বলেন না, ইহা প্রত্যক্ষও হইতে পারে আবার অপ্রত্যক্ষও হইতে পারে। সংসারে প্রত্যক্ষ

বিষয় অল্প, অপ্রত্যক্ষই বেশী, শাস্ত্র অনুমান ও যুক্তি দ্বারাই অপ্রত্যক্ষ বিষয় সমূহকেও (বিষয় বা বস্তু) প্রত্যক্ষের মতই উপলব্ধি করা যায়।

আত্রেয় বলেন—যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ প্রত্যক্ষকে উপলব্ধি করে, সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহও মূলতঃ অপ্রত্যক্ষ। আবার একথাও বিশেষ চিন্তা করা প্রয়োজন যে কতকগুলি কারণ ঘটিলে প্রত্যক্ষ বিষয়ও অপ্রত্যক্ষ হইয়া যায়। সেই কারণগুলি হইল এই ঃ—

(ক) দৃশ্য পদার্থ অত্যন্ত নিকটে থাকিলে বা অতি দূরে থাকিলে।

(খ) ইন্দ্রিয়গণের কোনও রোগ বা দুর্বলতা থাকিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ও উপলব্ধি হয় না। যেমন চোখের রোগে মানুষ দূর বা নিকটের বস্তু দেখিতে পায় না। কানের রোগ থাকিলে শব্দ শুনিতে পায় না। নাকের কোনও কোনও পীড়ায় গন্ধ বুঝিতে পারে না।

(গ) মনের অনবস্থিততা অর্থাৎ মন অন্য কারণে চঞ্চল থাকিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও বিষয় উপলব্ধির স্তরে পেঁাছায় না। যেমন অত্যন্ত ভয়াতুর অবস্থায় মনের সাম্য নষ্ট হইলে সেই ভীতিপ্রদ দৃশ্য ছাড়া তাহার পাশে আর কি ছিল তাহা প্রত্যক্ষ হয় না।

(ঘ) এক পদার্থের দ্বারা অন্য পদার্থের স্বরূপ ঢাকিয়া ফেলিলে অথবা অন্য পদার্থের অস্তিত্ব আবৃতকারী দ্বিতীয় কোনও পদার্থের অস্তিত্ব থাকিলে—

যেমন চিনি মিশ্রিত জলে প্রচুর তিক্ত স্বাদযুক্ত পদার্থ মিশাইলে চিনির প্রত্যক্ষ স্বাদ আর পাওয়া যায় না। অথবা চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া দ্বারা আবৃত চন্দ্রকে দেখা যায় না।

(ঙ) বস্তুর অতি সূক্ষ্মতা বশতঃ অনেক কিছুই দৃষ্টির সম্মুখে অস্তিত্ব-হীনের মত মনে হয়। এই অবস্থাতে যখন প্রত্যক্ষও অপ্রত্যক্ষ হইয়া যায় তখন যাহারা তর্ক করে যে প্রত্যক্ষ বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করা যায় অপ্রত্যক্ষ বিষয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার্য নহে তাহারা যুক্তিহীন কথা বলে।

মূল শ্লোক ঃ

কস্মাৎ প্রত্যক্ষংহ্যল্পমনল্প প্রত্যক্ষমস্তি যদাগমানুমানযুক্তিভিরুপলভ্যতে।
যৈরেব তাবদিন্দ্রিয়ৈঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে তান্যেব সন্তি চাপ্রত্যক্ষাণি।
সতাঞ্চ রূপাণামতি সন্নিকর্ষাদতি বিপ্রকর্ষাদাবরণাৎ করণ
দৌর্বল্যান্ম নোহনবস্থানাৎ সমানাভিহারাদভিভাবাদতি সৌক্ষ্ম্যাচ্চ
প্রত্যক্ষানুপলব্ধিঃ।

তস্মাদপরীক্ষিতমেতদুচ্যতে প্রত্যক্ষমেবাস্তিনান্যদস্তীতি।
শ্রুতয়শ্চৈতা ন কারণং যুক্তিবিরোধাৎ।

[চরক সংহিতা, সূত্র স্থানম্, তিস্রৈষণীয় অধ্যায়—শ্লোক ৪]

একথা স্পষ্ট হইল যে দৃষ্ট শ্রুত এবং অনুভূত বিষয়গুলি (তাহা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ যাহাই হউক না কেন) নিম্নলিখিত আটটি কারণে স্মৃতিতে পরিণত হয়।

(ক) কারণ নিরূপণ ঃ—আগে দেখা হইয়াছিল যে আগুন জ্বলিলে তাহা হইতে ধূম বাহির হয়। এতএব যে ক্ষেত্রে দূর হইতে ধূম দেখা যাইতেছে সে ক্ষেত্রে আগুন দেখা না গেলেও আগুনের স্মৃতির পুনরুদ্রেক হয়। ধূমের কারণ জানা আছে এবং তাহা স্মৃতিতে সংরক্ষিত আছে।

(খ) স্বরূপ নিরূপণ ঃ—

আগুন কেমন তাহা দেখা হইয়াছে। তাহার দাহিকাশক্তি আছে, তাপ আছে, আলো আছে। এ সমস্তই স্মৃতিতে সংরক্ষিত আছে। কাজেই আগুন দেখিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার তাপ, আলোক বিকীরণ ক্ষমতা বা দাহিকা শক্তির ধারণার পুনরুজ্জীবন হয়। কিন্তু প্রথমে আগুন দেখা বা তাহার তাপ প্রভৃতি অনুভবের ফলেই স্মৃতিতে তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা সংরক্ষিত ছিল।

(গ) সাদৃশ্য নিরূপণ ঃ—

গৈরিক বসনধারী মুণ্ডিতমস্তক কোনও সন্ন্যাসী দেখিয়া স্মৃতিতে সন্ন্যাসীর আকৃতি সংরক্ষিত আছে। ঐরূপ সাদৃশ্যযুক্ত ব্যক্তি দেখিলে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে স্মৃতির পুনরুদ্রেক ঘটে এবং ঐ ব্যক্তিকে সন্ন্যাসী বলিয়া চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

(ঘ) বৈসাদৃশ্য নিরূপণ ঃ—

কোনখানে অগ্নিকাণ্ডের সময় তাহা নিভাইতে জল ব্যবহার করা হইয়াছিল সুতরাং অগ্নির দাহিকা শক্তি, তাপ প্রভৃতির বিপরীত অর্থে জলের শীতলতা আদ্র্র্তার কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। আলোকের বিপরীত অন্ধকার। সুতরাং অন্ধকারে পথ চলিবার সময় আলোকের কথা স্মরণপথে উদিত হয়। গভীর সাংসারিক দুঃখের দিনে বিপরীতার্থক সুখের দিনগুলির কথা স্মৃতি-পথে উদিত হয়।

(ঙ) সম্বানুবন্ধ ঃ—

কার্যতঃ এই কারণটি সাদৃশ্য নিরূপণ এবং বৈসাদৃশ্য নিরূপণের মিলিত ফল বলা যায়। কোন হাটে গিয়া মানুষের সমবেত কথাবার্তার মধ্য দিয়া যে ধরণের কোলাহল স্মৃতিতে সংরক্ষিত হইল তাহার অনুরূপ কোলাহল সমবেত বহু মানুষের কোলাহলকে মনে করাইয়া দিল। সাদৃশ্য নিরূপণের দ্বারা এই স্মৃতির পুনরুদ্রেক হইল। আবার কোন নাট্যশালায় নাটক দেখিতে গিয়া বহুলোক সমাগমজনিত বা অন্যকারণে গ্রীষ্মজনিত অত্যন্ত কষ্টভোগের স্মৃতি মনে আছে। আর একটি নাট্যশালায় যথেষ্ট আরামে নাটক দেখিবার সময় ঐ পূর্বোক্ত নাট্যশালায় যে কষ্টভোগ হইয়াছিল তাহা স্মরণে আসে। যদিও এও স্মৃতি সম্বানুবন্ধের ফল তথাপি বলা যায় বৈসাদৃশ্য নিরূপণের ফলেই এই স্মৃতির পুনরুদ্রেক হইল। কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও জিনিষ কিনিয়া তৃপ্তি পাওয়ার স্মৃতি মনে সংরক্ষিত আছে। কয়েক বৎসর পরে সেইরূপ জিনিসই কিনিতে গিয়া দ্বিগুণ দাম শুনিয়া পিছাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার স্মৃতির (যাহা সুখকর ছিল) পুনরুদ্রেক হইল। এ সবই সম্বানুবন্ধের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আবার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের নিরূপণ ছাড়াও সম্বানুবন্ধ নিরূপিত হইতে পারে। একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল—এমন বন্ধুকে বহুকাল পরে দেখিয়া পূর্বের দিনগুলির কথা মনে উদিত হইল। অথচ বহুকালের ব্যবধানে উভয়েরই বয়স বাড়িয়াছে এবং চেহারারও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে পরিবর্তিত চেহারাতেও স্মৃতিতে পূর্বেকার চেহারা উদিত হইল—এও সম্বানুবন্ধ নিরূপণের ফলেই।

(চ) অভ্যাস ঃ—

পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে কোন পঠিত বা শ্রুত বিষয় স্মৃতিতে দৃঢ়মূল হইয়া যায়। পড়া মুখস্থ করা, নাটকের ভূমিকায় অভিনয় করা, গীত শিক্ষা, নানাবিধ শিল্প কলার চর্চা—সবই অভ্যাসের ফলে এমনভাবে স্মৃতিতে সংরক্ষিত ও পুনরুদ্রিক্ত হয় যে ঐ কাজ সকল অনায়াসে সম্পন্ন হয়।

(ছ) পুনঃ শ্রবণ ঃ—

যে সমস্ত স্মৃতি একবার বা দুইবার শোনার ফলে বা অল্প অভ্যাসের ফলে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল পুনঃ শ্রবণের ফলে তাহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

(জ) জ্ঞানযোগ দ্বারা ঃ—কোনও বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে সম্যকরূপ জ্ঞান

লাভের ফলে ঐ দ্রব্য বা বিষয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় স্মৃতি সংরক্ষিত হয়। জ্ঞান লাভের উপায় কি ? এ সম্বন্ধে আত্রেয় বলেন দ্রব্য বা বিষয় সকলকে পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়।

দ্বিবিধমেবখলু সর্বং সচ্চাসচ্চ। তস্য চতুর্বিধা পরীক্ষা।
আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষমনুমানং যুক্তিশ্চেতি।

(চরক সংহিতা সূত্র স্থান, একাদশ অধ্যায়, তিস্রৈষণীয় অধ্যায়, শ্লোক—১১)

দ্রব্য বা বিষয় সকল দুই প্রকার—সৎ এবং অসৎ। সৎই হোক বা অসৎই হোক তাহাদের যথাযথ বিশ্লেষণ চারি প্রকারের হইতে পারে : আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি।

এইবার পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা দ্বারা কিভাবে জ্ঞান লাভ হয় বিশ্লেষণ করিব।

আপ্তোপদেশ :—

আপ্তগণের উপদেশই আপ্তোপদেশ। আপ্তগণের উপদেশ সর্বদাই সত্য। কাজেই নিঃসংশয়ে বিশ্বাসযোগ্য।

রজস্তমোভ্যাং নির্মুক্তাস্তপোজ্ঞান বলেন যে।
যেষাং ত্রৈকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা
আপ্তাঃশিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ম্।
সত্যংবক্ষ্যন্তি তে কস্মাদসত্যংনীরজস্তম।

(ঐ ঐ শ্লোক—১২)

যাঁহারা জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা রজ ও তম গুণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়া শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞানের প্রবাহও নির্মল এবং সর্বদাই অব্যাহত গতিতে প্রবহমান। এইরূপ পুরুষকেই আপ্ত শিষ্ট ও জ্ঞানী বলে। রজ ও তম হইতে মুক্তিলাভ করার ফলে তাঁহারা কখনও মিথ্যা বলেন না বা মিথ্যা বিশ্বাসও তাঁহাদের নাই। কারণ শুদ্ধ সত্ত্বের বিকৃতি নাই। সুতরাং তাঁহাদের লব্ধ জ্ঞান ও তাহার প্রচার নিশ্চয়ই সত্য। এই উপদেশে বিশ্বাসের দ্বারাও বিষয় বা বস্তুর পরীক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে। এই বিশ্বাসের ফলে স্মৃতি এবং স্মৃতি হইতে প্রত্যয় জন্মে। প্রত্যয়ের বিষয় পরে আলোচনা করিব।

২। প্রত্যক্ষ—আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ একযোগে

কাজ করিলে তবেই ইন্দ্রিয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। (মনের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে)। এই জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ-বোধ বলে। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানও তিন রকমের: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এই তিন রকমের জ্ঞানই কিন্তু নিজে ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ না করিলে অন্যের জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নহে। কোনও ব্যক্তি অতীতে যে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা ভোগ করিয়াছে তাহার স্মৃতি বর্তমান কাল পর্যন্ত তাহার মনের মধ্যে জাগরূক আছে। আবার বর্তমানে যাহা ভোগ করিতেছে তাহার সহিত অতীত স্মৃতির সাদৃশ্য থাকুক বা না থাকুক অতীত এবং বর্তমান প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পাশাপাশি মনের মধ্যে আছে। অতীত প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বর্তমান প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিতেছে। আর পরস্পর বৈসাদৃশ্য থাকিলে দুই জ্ঞানই মনকে অভিজ্ঞতা দিতেছে। ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, অতীত ও বর্তমান প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হইতেছে। এইরূপে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ বোধের মধ্যে শৃঙ্খলাপূর্ণ সম্পর্ক থাকিয়া যাইতেছে।

অতীত প্রত্যয়ের স্মৃতি ও বর্তমান প্রত্যক্ষ

মূল শ্লোক:—

আত্মেন্দ্রিয় মনোঽর্থানাং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ততে।
ব্যক্তা তদাত্বে যা বুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষং সা নিরুচ্যতে।
প্রত্যক্ষপূর্বং ত্রিবিধং ত্রিকালঞ্চানুমীয়তে।

(ঐ ঐ শ্লোক—১৩)

৩। অনুমান—সব সময়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ বোধের উপর স্মৃতি গঠিত হয় না। (এ বিষয়ে আগেই প্রত্যক্ষ ও অ-প্রত্যক্ষ বিচারের সময় বলা হইয়াছে)। এজন্য অনেক সিদ্ধান্তই অনুমানের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। যদিও মূলতঃ অনুমান অতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা আপ্তোপদেশের সাহায্যেই স্মৃতিতে স্থান পায়। যে মানুষ অনুমানের সাহায্যে দ্রব্য বা বিষয়কে পরীক্ষা করে তাহার নিজস্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞান ঐ বিষয়ে নাও থাকিতে পারে। কিন্তু অপরের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া সেই অনুমান সাপেক্ষ বিচার ধারাকে সে আয়ত্ত করিতে পারে। মোটের উপর কাহারও না কাহারও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া অনুমান সম্মত বিচার করিতে হয়।

অনুমানেরও আবার প্রকার ভেদ আছে: (অ) কার্যলিঙ্গ অনুমান (আ) কারণলিঙ্গ অনুমান (ই) কার্যকারণ লিঙ্গ অনুমান।

(অ) কার্যলিঙ্গ অনুমান—একটি চিহ্নমাত্র প্রত্যক্ষ হইতেছে অথচ কারণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু যে কারণ হইতে প্রত্যক্ষীভূত চিহ্নের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে অতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। তাহা দ্বারাই বর্তমানে দেখা চিহ্নটির কারণ সম্বন্ধেও অনুমান করা যায়। উদাহরণ ধূম দেখা যাইতেছে। আগেই জানা আছে আগুন হইতেই ধূম জন্মে। এ অবস্থায় দূর হইতে ধূম দেখিয়া অনুমান করা যায় ঐ স্থানে আগুনও আছে।

বহ্নি নির্গূঢ়োধূমেন, মৈথুনং গর্ভদর্শনাৎ
এবং ব্যবস্যতেঽতীতং বীজাৎ ফলমনাগতম্ ॥

(চরক সংহিতা, ত্রিএষণীয় অধ্যায়, শ্লোক—১৫)

(আ) কারণ লিঙ্গ অনুমান—একটি চিহ্ন দেখা যাইতেছে। কিন্তু ঐ চিহ্ন যে কারণ হইতে উৎপন্ন সেই কারণ বহু পূর্বেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখন ঐ কারণের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ঐ কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। কাজেই বর্তমান চিহ্ন দেখিয়া অতীতের কারণ সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। উদাহরণ—গর্ভবতী স্ত্রীলোককে দেখিয়া অনুমান করা যায় যে অতীতে নিশ্চয়ই মৈথুনকার্যে লিপ্ত হইয়াছিল।

(ই) কার্যকারণলিঙ্গ অনুমান—একটি চিহ্ন দেখিয়া অতীতে কি ঘটিয়াছিল এবং ঐ চিহ্ন হইতে ভবিষ্যতে কি কার্য্য ঘটিতে পারে তাহা অনুমান করা যায়। উদাহরণ—একটি ফলের বীজ দেখিয়া সেই বীজের উৎপত্তি স্বরূপ ফলটির কথা চিন্তা করা যায়! এবং ঐ বীজ হইতে ভবিষ্যতে কেমন গাছ হইবে—কেমন ফল হইবে তাহা অনুমান করা যায়।

এখন চতুর্থ পরীক্ষা যুক্তির বিষয় আলোচনা করা যাক।

৪। যুক্তি :—

বুদ্ধিঃ পশ্যতি যা ভাবান্ বহুকারণ যোগজান্।
যুক্তি স্ত্রিকালা সা জ্ঞেয়া ত্রিবর্গঃ সাধ্যতে যয়া।

(ঐ ঐ শ্লোক—১৭)

যে বুদ্ধি অনেক রকম কারণ হইতে অনেক রকমের ফল দেখিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ যে বুদ্ধি কোনও একটা কারণের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে তাহাই যুক্তি।

কৃতস্য কর্মণঃ ফলং নাকৃতস্য নাঙ্কুরোৎপত্তিরবীজাৎ।
কর্ম সদৃশং ফলং নান্যস্মাদ্বীজাদন্য স্যোৎপত্তিরিতি যুক্তিঃ।
(ঐ ঐ শ্লোক—২১)

কর্তা ও কারণ এই দুইয়ের সংযোগ না হইলে ক্রিয়া হয় না। বীজ ছাড়া অংকুরের উৎপত্তি হয় না। কৃতকর্মেরই ফল আছে, যে কর্ম করা হয় নাই, তাহার ফল লাভ হইতে পারে না। যেমন কর্ম করা যায় ফল লাভও সেইরূপই হয়। এক বীজ হইতে অন্য রকমের গাছ জন্মিতে পারে না। এইসব বিবেচনাকেই যুক্তি বলা হয়। যুক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্ত জ্ঞানেরই অপেক্ষা করে। অর্থাৎ বিচার বিশ্লেষণ করিবার সময় অতীত জ্ঞান, ভবিষ্যৎ ফলের অনুমান এবং বর্তমান সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণা সকল কিছুরই প্রয়োজন হয়।

যেমন কর্ম
তেমন ফল

জলকর্ষণ বীজর্তু সংযোগাচ্ছস্য সম্ভবঃ।
যুক্তিঃ ষড়্ধাতু সংযোগাদ্গর্ভাণাং সম্ভবস্তথা।
মথ্য মন্থন মন্থান সংযোগাদগ্নি সম্ভবঃ।
যুক্তিযুক্তা চতুষ্পাদ সম্পদ্ব্যাধিনিবর্হনী॥
(ঐ ঐ শ্লোক—১৫)

যুক্তির উদাহরণ—জল, কৃষি ও ঋতু সবকিছুর অনুকূল সংযোগে শস্য জন্মে। ষড়্ধাতুর সংযোগে গর্ভ উৎপন্ন হয়। মথ্যকাষ্ঠ, মন্থনকাষ্ঠ এবং মন্থন কর্তা তিনের ক্রিয়ার মধ্যেই অগ্নি উৎপন্ন হয়। (প্রাচীনকালে এইরূপেই অগ্নি জ্বালান হইত।) চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত চতুষ্পাদের যোগে ব্যাধির নাশ হয়।

প্রত্যয়

স্মৃতি সম্বন্ধে যে পরীক্ষাদির কথা বলা হইল ঐগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই প্রত্যয়েরও উৎপত্তি হয়। প্রত্যয়ের উৎপত্তি সময়ে প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা—কিছু পর্যবেক্ষণ, কিছু বিশ্লেষণ, কিছু তুলনামূলক বিচার সব কিছুই একত্রিত হয়। অতীতে হয়ত প্রত্যয়ের বিষয়গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, পরে লোক পরম্পরায় সংযুক্ত হইয়া এক একটি নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। সমাজ জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ কিছু কিছু প্রত্যয়ের দ্বারা চালিত হয়। ইহা মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য। সমষ্টি বা ব্যষ্টি মানব

এই প্রত্যয়ের দ্বারা তাহাদের কার্যকলাপের অনেকাংশ কেন নিয়ন্ত্রণ করে ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন।

মনোদর্শনে প্রত্যয়ের বিশেষ স্থান আছে। বহু প্রত্যয়—যে ভাবেই উৎপন্ন হোক না কেন আর নূতন কোন বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা করে না। অথচ এই প্রত্যয়গুলি মানুষের মনকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করে—অতীতেও করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে। প্রত্যয়ের একটি বিশেষ উপকারিতা আছে। প্রত্যয় অনাবশ্যক স্মৃতির ভারকে লঘু করে। বিচার বিশ্লেষণের পরিশ্রম হইতে মনকে মুক্তি দেয়। বহুরকমের জটিল চিন্তাকে সহজধারায় প্রবাহিত করিতে মনকে সাহায্য করে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রত্যয়ের কিছু বিশেষ উদাহরণ উপস্থিত করিব।

কাহারও বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসককে ডাকা হইলে চিকিৎসক যাইবার পূর্বে কতকগুলি শুভ বা অশুভ লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিয়া লইবেন—এইভাবে আয়ুর্বেদকারগণ নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা ঐসব চিহ্নগুলি রোগীর আরোগ্য লাভ বা উপশয় নির্দেশ করে।

(উপশয়—কোনও লক্ষণ দ্বারা স্থির করা যে রোগী আরোগ্য লাভ করিবে কিনা অথবা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইবে কিনা)।

এই উদাহরণগুলি প্রত্যয় হিসাবেই চিকিৎসক পরম্পরায় প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও আংশিকভাবে আছে। বিপরীতাবিপরীত দূত শকুন স্বপ্ন নিদর্শনীয় অধ্যায়কে এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যায়। সুশ্রুত সংহিতা এবং বাগভটকৃত অষ্টাঙ্গ হৃদয় গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। সুশ্রুত সংহিতায় সূত্রস্থান ঊনত্রিশতম অধ্যায়ে এইগুলি বিবৃত আছে। আমি উদাহরণ উল্লেখের সময় অধ্যায় উল্লেখ করিব না শুধুমাত্র শ্লোকসংখ্যা উল্লেখ করিব।

সুশ্রুত বলেন ঃ—

দূতদর্শনসম্ভাষা বেশাশ্চেষ্টিতামেব চ
ঋক্ষংবেলা তিথিশ্চৈব নিমিত্তং শকুনোঽনিলঃ
দেশোবৈদ্যস্য বাগ্দেহ মনসাঞ্চ বিচেষ্টিতম্
কথয়ন্ত্যাতুরগতং শুভং বা যদি বাঽশুভম্।

(শ্লোক—১)

যে ব্যক্তি রোগী দেখিবার জন্য চিকিৎসককে ডাকিতে আসে তাহাকে দূত বলা হয়। এই দূতের কথাবার্তা, আকার, বেশ বা পরিচ্ছদ ও কার্যাদি লক্ষ্য করিতে হয়। এ ছাড়া নক্ষত্র, বেলা, তিথি, মঙ্গল বা অমঙ্গলদায়ক পক্ষী, বায়ুর গতি, চিকিৎসকের নিজের অবস্থা, শারীরিক বা মানসিক কার্য—এ সবই রোগীর শুভ বা অশুভের জন্য দেখিতে হয়। দূতের মধ্য দিয়া যে শুভ লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া সুশ্রুত বলিয়াছেন।

পাষণ্ডাশ্রমবর্ণানাং স্বপক্ষাঃ কর্মসিদ্ধয়ে
ত এব বিপরীতাঃ স্যুদূতাঃ কর্মবিপত্তয়ে

(ঐ শ্লোক—২)

বাগভটও অনুরূপ একটি শ্লোক বলিয়াছেন। অর্থাৎ রোগী যে আশ্রমের দূতও সেই আশ্রমের হইলে অথবা রোগী ও দূত একবর্ণ যেমন গৃহী রোগীর গৃহী দূত অথবা সন্ন্যাসী রোগীর সন্ন্যাসী দূত হইলে শুভ-জনক। আবার বিপরীত হইলে অমঙ্গলজনক। যে রকমের দূত ডাকিতে আসিলে রোগীর অমঙ্গল হইবে তাহার চিহ্ন উল্লেখ করিতে গিয়া সুশ্রুত বলেন—

নপুংসকং স্ত্রীবহবোনৈক কার্য্যা অসূয়কাঃ
গর্দভোষ্ট্ররথপ্রাপ্তা প্রাপ্তা বা স্যুঃ পরম্পরাঃ
বৈদ্যং য উপসর্পন্তি দূতাস্তে চাপিগর্হিতাঃ।

(ঐ শ্লোক—৩)

নপুংসক (হিজড়া) বহুপত্নীযুক্ত মানব যে কেবলমাত্র চিকিৎসককেই ডাকিতে আসে নাই নানা কাজে আসিয়াছে তাহার মধ্যে চিকিৎসককেও ডাকা অন্যতম কাজ, কলহপ্রিয় মানুষ অথবা গর্দভ বা উষ্ট্রবাহিত রথে চড়িয়া আসিয়াছে, অথবা লোক পরম্পরায় রোগীর বিষয় শুনিয়া ডাকিতে আসিয়াছে—এই সব রকমের দূত চিকিৎসককে ডাকিতে আসিলে অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিবে।

বাগভট ইহার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করিয়াছেন ঃ—

দীনং ভীতং দ্রুতং ত্রস্তং রুক্ষামঙ্গলবাদিনম্
শস্ত্রিণং দণ্ডিনং ষণ্ডং মুণ্ডশ্মশ্রুং জটাধরম্।

(শারীর স্থান ৬ষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টাঙ্গ হৃদয়, বাগভট, শ্লোক—৭)

মলিন, ভীত এবং যে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়াছে—কোন অস্ত্র বা দণ্ড (লাঠি) হাতে করিয়া আসিয়াছে, দাড়ি, গোঁফে ঢাকা মুখমণ্ডল এবং মাথায় জটা আছে এমন দূত অথবা রুক্ষ এবং অমঙ্গলজনক কথাবার্তা বলে এমন দূত অমঙ্গলজনক। এই সকল দূত কেন অমঙ্গলজনক আর কি অমঙ্গলই বা ইহাদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে এই প্রশ্ন করিলে একমাত্র প্রত্যয় কথাটি ছাড়া আর কোনও উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। কোন চিকিৎসকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বর্ণিত কোনটি বা যুক্তি বিশ্লেষণের দ্বারা গৃহীত কোনটি বা সম্পূর্ণভাবে মনের প্রফুল্লতা বা বিষণ্ণতা উৎপাদনে সাহায্য করে এই ধরণের অনেক কয়েকটি বিষয় একত্রে যুক্ত হইয়া এই প্রত্যয় সৃষ্টি করিয়াছে এবং চিকিৎসক পরম্পরায় প্রচলিত থাকিতে থাকিতে দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। যেমন নপুংসক দেখিলে শুভ কার্যে বাধা হয় ইহা প্রচলিত ধারণা। ভীত-ত্রস্ত দূত আসিলে রোগীর অবস্থা যে ভালো নাই বোঝাই যায়। এইসব ধারণার উপরে এই প্রত্যয়গুলির ভিত্তি গঠিত। এই রকমের বহু দূতের বর্ণনা আছে যাহারা অমঙ্গলজনক। বাগভট ও সুশ্রুতে এ বিষয়ে দীর্ঘ অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যবোধে উল্লেখ করিলাম না।

আবার দূত যখন ডাকিতে আসিয়াছে তখন চিকিৎসক কি অবস্থায় আছেন ইহাও বিচার্য। ইহা দ্বারাও রোগীর মঙ্গল বা অমঙ্গল বিচার হয়।

বাগভট বলেন—

অশস্তচিন্তা বচনে লগ্নে ছিন্দতি ভিন্দতি।
জুহানেপাবকং পিণ্ডান্ পিতৃভ্যোনির্বপত্যাপি ॥
সুপ্তেমুক্তকচেহভ্যক্তে রুদত্যপ্রয়তে তথা।
বৈদ্যে দূতা মনুষ্যাণামাগচ্ছন্তি মুমূর্ষতাম ॥

(বাগভট অষ্টাঙ্গ হৃদয়, শারীর স্থান ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক—৬।৭)

বৈদ্য মনে ও বাক্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অবস্থায় আছেন অথবা কোনও কারণে উলঙ্গ অবস্থায় আছেন অথবা কিছু কাটিতেছেন বা ভেদ করিতেছেন—আগুনের তাপের সম্মুখে কিছু কাজ করিতে করিতে তপ্ত হইয়াছেন—পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিতেছেন—নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন—মুক্তকেশে তৈল মর্দন করিতেছেন অথবা কোনও কারণে দুঃখ বশতঃ রোদন করিতেছেন—ঐ রকমের অবস্থায় যে বৈদ্য আছেন তাঁহার নিকট দূত আসিলে বুঝিতে হইবে সে রোগীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।

সুশ্রুত বলেন—

দক্ষিণাভিমুখং দেশে অশুচৌ বা হুতাশনং
জ্বলয়ন্তং পচন্তং বা ক্রূরকর্মণি চোদ্যতং
নগ্নং ভূমৌ শয়ানং বা বেগোৎসর্গেষুবাহশুচিং
প্রকীর্ণকেশমভ্যক্তং স্বিন্নং বিক্লব মেব চ
বৈদ্যান্তে উপসর্পন্তি দূতাস্তে বাপিগর্হিতাঃ

(সুশ্রুত শ্লোক—৫)

দক্ষিণদিকে অশুচি অবস্থায় বসিয়া আছেন অথবা অগ্নির নিকটে বসিয়া কিছু পাক করিতেছেন, পশুবধের মত কোন ক্রূর কর্ম করিতেছেন, কোনও কারণে উলঙ্গ অবস্থায় অথবা মাটিতে শয়ন করিয়া আছেন, মস্তকেশে তৈল মর্দন করিতেছেন—এইরূপ অবস্থাপন্ন অথবা পিতৃকার্য্যে নিযুক্ত বৈদ্যের নিকটে যাওয়া রোগীর পক্ষে অমঙ্গলজনক। চিকিৎসক পরম্পরায় বহু প্রচলিত এই প্রত্যয়গুলির মানসিক দিকও অবশ্য বিবেচ্য। যে যে অবস্থাগুলি বলা হইয়াছে ইহার যে কোন অবস্থাতেই চিকিৎসকের পক্ষে মন স্থির করিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতে যাওয়া কঠিন। চিকিৎসকও মানুষ। তিনি মানবসত্তার ঊর্দ্ধে নন। তাঁহারও মানসিক অস্থিরতা থাকা খুবই সম্ভব। প্রকারান্তরে এই নির্দেশগুলিতে তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং এইগুলি প্রত্যয় রূপেই সমাজের অনুশাসনে পরিণত হইয়াছে। তবে যে সমাজব্যবস্থার কালে এগুলি বলা হইয়াছে এই প্রত্যয়গুলি বিচারের সময় সেই সামাজিক ব্যবস্থা মনে রাখা উচিত। এই প্রত্যয় অতীতে সমাজ মনে গৃহীত হইলেও বর্তমান কাল পর্য্যন্ত ইহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। এইবার শুভ সূচক দূতের লক্ষণ বর্ণনা করিব। এই শুভ লক্ষণযুক্ত দূতের চিহ্নসকল বর্ণনার দ্বারাই কেন যে পূর্ব বর্ণিত দূতগণ অশুভ বা অমঙ্গলের প্রতীক তাহা বোঝা যাইবে।

শুক্লবাসাঃ শুচির্গৌরঃশ্যামো বা প্রিয়দর্শনঃ।
স্বস্যাং জাতৌ স্বগোত্রো বা দূতঃ কার্য্যকরঃ স্মৃতঃ ॥
গোযানেনাগতস্তুষ্টঃ পাদাভ্যাং শুভচেষ্টিতঃ।
ধৃতিমান বিধিকালজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ প্রতিপত্তিমান্ ॥
অলঙ্কৃতো মঙ্গলবান্ দূতঃ কার্য্যকরঃ স্মৃতঃ।

স্বচ্ছং প্রাঙ্মুখমাসীনং সমেদেশে শুচৌশুচিং।
উপসর্পতি যো বৈদ্যঃ স চ কার্যকরঃ স্মৃতঃ॥

(সুশ্রুত সংহিতা, ঐ অধ্যায়, শ্লোক —৭)

শুভ্রবস্ত্র পরিহিত পবিত্র গৌরবর্ণ বা শ্যামবর্ণ, প্রিয়দর্শন, রোগীর স্বজাতি বা সগোত্র দূত রোগীর পক্ষে হিতকর। গো-যান বা পদব্রজে আসিয়াছে সন্তুষ্টমনা নিয়মজ্ঞান সম্পন্ন স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে জ্ঞানযুক্ত মঙ্গলচিহ্নযুক্ত অলংকার পরিহিত দূত রোগীর পক্ষে হিতকর।

আবার বৈদ্যের অবস্থার কথায় উল্লেখ করা হইয়াছে—সুস্থ দেহ ও মনযুক্ত বৈদ্য পূর্বমুখ হইয়া সমতলস্থানে সুখে বসিয়া আছেন এবং রোগীর চিকিৎসা বা গ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি পবিত্র কার্যে লিপ্ত আছেন এমন অবস্থায় চিকিৎসককে আহ্বান করা রোগীর পক্ষে মঙ্গলদায়ক। পূর্ববর্ণিত অশুভ দূত এবং শুভ দূতের দর্শনে চিকিৎসকের মনে যে তুলনামূলক প্রতিক্রিয়া হয় তাহাই বোধ হয় এই প্রত্যয়ের উৎপত্তির কারণ। একটি বিকৃত দর্শন —মলিনবেশধারী, রুক্ষভাষী অথবা দণ্ড এবং পাশধারী (দড়ি হাতে) কাদা-মাখা দেহ এবং অন্তঃসারশূন্য ফল হাতে যে দূত—তাহার পাশাপাশি প্রিয়দর্শন মধুরভাষী শুচি বেশযুক্ত কাহাকেও দেখিলে মনে যে ভাবের উদয় হইতে পারে তাহাই এই নির্দেশগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

এ ছাড়াও চিকিৎসক বা দূতের যাত্রাকালেও অনেকগুলি শুভ বা অশুভ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। সবগুলি মূলতঃ এই ধরণেরই। এছাড়া কোন রোগাক্রান্তরোগী দেখিতে যাইবার সময় কোন চিহ্ন অশুভ তাহাও বর্ণিত আছে। যেমন রক্ত পিত্তে আক্রান্ত রোগী দেখিতে যাইবার সময় রক্তপাত দেখা অমঙ্গলজনক। এই সমস্ত লক্ষণ বর্ণনার জন্য সুশ্রুত এবং বাগভট এক একটি দীর্ঘ অধ্যায় ব্যয় করিয়াছেন। তাহার সব কয়টি উল্লেখ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। আমার উদ্দেশ্য—এই সকল চিহ্ন বর্ণনার মানসিকতার পটভূমিতে প্রত্যয় কি, প্রত্যয়ের কারণ কি, বা কিভাবে প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয় —সামাজিক কার্যকলাপে প্রত্যয় কিভাবে ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং প্রত্যয়ের উপকারিতা কিছু আছে কিনা তাহাই বিচার বিশ্লেষণ এবং উদাহরণ সহযোগে উদ্ধৃত করা।

তাহার উদাহরণ স্বরূপই দীর্ঘ অধ্যায় হইতে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি দিয়া প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইল।

নবম অধ্যায়

স্বপ্ন দর্শন

মনোবিদ্যার একটি বিশিষ্ট অধ্যায় এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ। আধুনিক মনোবিদ্যায় স্বপ্নের উৎপত্তি, স্বরূপ এবং বিশ্লেষণ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের মতভেদ আছে। আয়ুর্বেদকারগণ স্বপ্নকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই এই অধ্যায়ের বিচার্য বিষয়।

মানুষ নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে। (স্বপ্ন) নিদ্রা অর্থে এবং স্বপ্ন একই ধাতুর ভিন্ন রূপ। সুশ্রুত বলেন—

নিদ্রান্তু বৈষ্ণবীংপাপ্মানমুপদিশন্তি সা স্বভাবত এব সর্বপ্রাণিনোহভিস্পৃশতি।

(সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান, ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক—১৬)

নিদ্রা বৈষ্ণবী মায়া, ইহা স্বভাবতঃই সকল প্রাণীকে অভিভূত করে।

আত্রেয় বলেন—(চরক সংহিতা)

যদা তু মনসি ক্লান্তে কর্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ।
বিষয়েভ্যোঃ নিবর্তন্তে তদা স্বপিতি মানবঃ॥

দেহ শ্রান্ত হইলে কর্মে প্রবৃত্তিদায়ক মন ক্লান্ত হয় এবং বাহ্যিক বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। তাহাতেই মানুষ নিদ্রাচ্ছন্ন হয়।

ডল্লন তাঁহার নিবন্ধ সংগ্রহে বলিয়াছেন—

মনসঃ শ্রান্তত্বাদ ভূতাত্মানোবিষয় নিবৃত্তোপ্রাণিনঃ স্বপন্তি। সর্বাসাং অপি নিদ্রানাং তমো হেতুঃ।

তমোগুণের প্রাধান্যই সর্বপ্রকারের নিদ্রার হেতু। নিদ্রা তিন প্রকার বলিয়া সুশ্রুত উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন আচার্য সপ্তবিধ নিদ্রা আছে ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু সুশ্রুত বলিয়াছেন নিদ্রা তিন প্রকার। শ্রীডল্লন বলিয়াছেন—যদিও তমোগুণের বৃদ্ধি হেতুই সকল প্রকার নিদ্রাই জন্মে তবুও তম প্রকৃষ্টভাবে আচ্ছন্ন করিলে

নিদ্রার উৎপত্তি ও প্রকার ভেদ

যে নিদ্রা জন্মে তাহাই প্রকৃষ্ট তামসী নিদ্রা। সে নিদ্রা হইতে মানুষ আর জাগরিত হয় না। অর্থাৎ মৃত্যুর আগে সে নিদ্রা জীবকে আচ্ছন্ন করে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—

> তত্র যদা সংজ্ঞাবহাণি স্রোতাংসিতমোভূয়িষ্ঠঃ শ্লেষ্মা প্রতিপদ্যতে তদা তামসী নাম নিদ্রা সম্ভবত্যনববোধিনী সা প্রলয়কালে।
>
> (শারীর স্থান, ৪র্থ অধ্যায়, ঐ ঐ শ্লোক—১৬)

যখন তমোগুণাধিক শ্লেষ্মা সংজ্ঞাবহ স্রোত সকলকে আচ্ছন্ন করে তখন তামসী নিদ্রার দ্বারা জীব আচ্ছন্ন হয়। এবং অনববোধিনী যে নিদ্রা তাহা মৃত্যুকালেই হয়। সেই অনববোধিনী নিদ্রা হইতে জীব আর জাগরিত হয় না।

ডল্লনাচার্য টীকায় বলিয়াছেন—

যদ্যপি সর্বাসাং অপি নিদ্রাণাং তমোহেতুস্তথাপি প্রকৃষ্ট তমস্তাৎ তামসীরূপা নিদ্রা কথ্যতে।

যদিও সবরকমের নিদ্রাই তমোগুণের প্রভাবহেতু জন্মে—তবু প্রকৃষ্টরূপে তম দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেই তাহাকে তামসী নিদ্রা বলা হয়।

ইহা বোঝা যাইতেছে যে তামসী নিদ্রামাত্রই মৃত্যুকালীন নিদ্রা নয়। প্রকৃষ্টরূপ তামসী নিদ্রাই অনববোধিনী নিদ্রারূপে ব্যাখ্যাত হয়। এ ছাড়া আরও দুই রকমের নিদ্রার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। স্বাভাবিকী এবং বৈকারিকী। স্বাভাবিক নিদ্রার সংজ্ঞা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

ধন্বন্তরির উক্তি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

> হৃদয়ংচেতনা স্থানমুক্তং সুশ্রুত দেহিণাং
> তমোঽভিভূতে তস্মিংস্তু নিদ্রা বিশতি দেহিণাং।
> নিদ্রাহেতুস্তমঃ সত্ত্বং বোধনে হেতুরুচ্যতে
> স্বভাব এব বা হেতুর্গরীয়ান পরিকীর্ত্যতে।
>
> (সুশ্রুত সংহিতা, ঐ ঐ শ্লোকাংশ—১৮)

ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—হে বৎস সুশ্রুত চেতনা স্থান বলিয়া কথিত হৃদয় যখন তমোগুণে অভিভূত হয় তখন নিদ্রা দেহে প্রবেশ করে। তমোগুণ নিদ্রার হেতু। প্রকৃতিই ইহার প্রধান নিয়ন্ত্রণকর্ত্রী বলিয়া জানিবে।

বৈকারিকা নিদ্রা ঃ

সুশ্রুত বলিয়াছেন—

ক্ষীণ শ্লেষ্মাণামনিল বহুলানাং মনঃ
শরীরাভিতাপবতাঞ্চনৈব সা বৈকারিকী ভবতি।

(ঐ ঐ শ্লোক—১৭)

ক্ষীণ শ্লেষ্মাবিশিষ্ট ব্যক্তির এবং যাহার বায়ু কুপিত হইয়াছে অথবা শরীর এবং মন অত্যন্ত সন্তাপিত হইয়াছে এমন মানুষের নিদ্রা হয় না। কিন্তু যদি নিদ্রা হয় তাহা গাঢ় হয় না বা স্বাভাবিক হয় না। নিতান্তই ক্লান্তিবশতঃ যে অস্বাভাবিক নিদ্রা হয়, তাহাকেই বৈকারিকী নিদ্রা বলে। নিদ্রার প্রকার ভেদ এবং নিদ্রার কারণ সম্বন্ধে আলোচনার পর আমরা স্বপ্ন দর্শন সম্বন্ধে বিচার ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইব।

স্বপ্নের উৎপত্তি

দেখা যাইতেছে শরীর ক্লান্ত হইলে জ্ঞানবহ শ্রোতসকল তমোগুণের প্রভাবে আচ্ছন্ন হইলে নিদ্রা হয়। তাহা হইলে স্বপ্ন দেখে কে?

ইহার উত্তরে ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—

পূর্ব দেহানুভূতাংস্তু ভূতাত্মা স্বপতঃ প্রভুঃ।
রজোযুক্তেন মনসা গৃহ্ণাত্যর্থান্ শুভাশুভান্।
করণাণাং তু বৈকল্যে মতসাভিপ্রবর্দ্ধিতে।
অস্বপন্নপি ভূতাত্মা প্রসুপ্ত ইব চোচ্যতে।

(ঐ ঐ শ্লোক—১৮)

যদিও শরীরের প্রভু সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ (মনের সংজ্ঞা অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে) তমোগুণের প্রভাবে নিদ্রিত হইয়াছে কিন্তু রজোগুণের প্রভাবে মন নিদ্রার পূর্বেকার শুভাশুভ ক্রিয়াগুলি গ্রহণ করিয়া পুনরায় পরিস্ফুট করে। তাহাতেই স্বপ্ন দর্শন হয়। তমোগুণের প্রভাবে ইন্দ্রিয়সকল বিকল হইলে— জীবাত্মা নিদ্রিত না হইলেও নিদ্রিতের মত মনে হয়। সেইজন্যই এই প্রশ্ন মনে ওঠে যে, স্বপ্ন কে দর্শন করে। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয়গণ তখন নিদ্রায় কর্মহীন এ অবস্থায় একমাত্র জীবাত্মাই সেই স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে নিদ্রার পূর্বেকার শুভাশুভ হইতে ক্রিয়া গ্রহণ

করিয়া মন আবার তাহা পরিস্ফুট করে। নিদ্রার পূর্বে যাহা ঘটে নাই তাহা হইতে ক্রিয়া গ্রহণ করে না। শ্রীডল্লন তাঁহার নিবন্ধ সংগ্রহে বলিয়াছেন—

স্মৃতিরেবায়ং পূর্বাহিনুভূতেঽর্থে ন চাননুভূত বিষয়াঃ পরিস্ফুরন্তি।

যাহা ঘটে নাই—অনুভূত হয় নাই বা যাহা শ্রুত হয় নাই তাহা স্মৃতিতে গ্রাহ্য হয় না এবং পুনরায় পরিস্ফুট হয় না। যাহা পূর্বে অনুভূত হইয়াছে তাহাই পরিস্ফুট হইতে পারে।

ডল্লন আরও বলিয়াছেন—

স্বাপযুক্তস্য শরীরস্য স্বামীক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যর্থ। তদ্বশেন সর্বক্রিয়া প্রবৃত্তেঃ। কথং পুনরর্থানিন্দ্রিয়গ্রাহ্যান্ নিদ্রালুপ্তেন্দ্রিয়েষু গৃহ্নাতীত্যাহ—মনসেতি।

সুপ্ত শরীরের প্রভু ক্ষেত্রজ্ঞ। তাহার চালনাতেই সব ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয়। তাহা হইলে ঘুমন্ত ইন্দ্রিয়সকল কি করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ গ্রহণ করে? ইহার উত্তর হইল—মনের দ্বারা। রজগুণের প্রভাবে মন পূর্বানুভূত বিষয় সকলকে স্বপ্নে পরিস্ফুট করে।

ডল্লন বলেন—

রজসঃ প্রবর্ত্তত্বাৎ।

—রজগুণের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া।

তমোযুক্তেন চ মনসা ন কিমপি পশ্যতি তমসঃ আবরণাত্মকত্বাৎ।

—তমোগুণের আবরণ প্রভাবে মন স্বপ্ন দেখিতে পারে না—যদি না রজ-গুণের প্রভাবে প্রবর্তিত হয়। এ ছাড়াও ডল্লন অন্তর্মনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

তত্র বহিরিন্দ্রিয়াণাং বিষয় ভূতেঽর্থে অন্তর্মনোঽর্থেঽপি সুখদুঃখাদৌ।

বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সকলের যে যে ভোগ্য বিষয় আছে অন্তর্মনেরও সেই সেই ভোগ্য বিষয় সুখ দুঃখাদি আছে। অন্তর্মনও তাহা তাহাই অনুভব করে।

অন্তর্মনের অস্তিত্ব

ডল্লনের ভাষ্যে ইহাই প্রতীয়মান হয় বাহিরের সুখ দুঃখ অন্তর্মন গ্রহণ করে এবং স্বপ্নে পরিস্ফুট করে। এবং ঐ অন্তর্মনই সুশ্রুত উক্ত ভূতাত্মা। যে ভূতাত্মা নিদ্রিতের ন্যায় বোধ হইলেও নিদ্রিত হয় না।

(এ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের স্বপ্ন বিশ্লেষণে উক্ত সংজ্ঞান (conscious) আসংজ্ঞান (pre-conscious) নির্জ্ঞান (un-conscious) মনের কথা সহজেই উত্থাপন করা যায়। ফ্রয়েড সংজ্ঞান হইতে নির্জ্ঞান স্তরে আশা আকাঙ্ক্ষার অবদমনই স্বপ্নের কারণ বলিয়াছেন।)

বাগভট বলেন—

সর্বেন্দ্রিয়ব্যুপরতো মনোঽনুপরতং যদা
বিষয়েভ্যস্তদা স্বপ্নং নানারূপং প্রপশ্যতি

(বাগভট অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ষষ্ঠ অধ্যায়, টীকা ৪২, শারীর স্থান, দূতাদি বিজ্ঞানীয়ম অধ্যায়)

সর্ব ইন্দ্রিয় নিদ্রায় আবৃত হইলেও মন যখন অনাবৃত থাকে তখন মন ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে আহরণ করিয়া নানারূপ স্বপ্ন পরিস্ফুরণ করে।

মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—

মনোবহাণাং পূর্ণত্বাদ্দোষৈরতি বলৈস্ত্রিভিঃ। স্রোতসাং দারুণান্ স্বপ্নান্
কালে পশ্যতি দারুণে
নাতি প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ সফলানফলানপি। ইন্দ্রিয়েশেন মনসা স্বপ্নান্
পশ্যত্যনেকধা ॥

(চরক সংহিতা, ইন্দ্রিয় স্থান, ৫ম অধ্যায়, পূর্বরূপীয়ম অধ্যায়, শ্লোক - ২৮)

ত্রিদোষ কুপিত হইয়া মনোবহ স্রোতসকলকে পূর্ণ করিলে লোকে দারুণ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। আবার সব স্বপ্নই যে দারুণ হইবে তাহাও নহে। অদারুণ স্বপ্নও হইতে পারে। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয় নাই এমন পুরুষ মনের অসুপ্তিবশতঃ সফল বা বিফল নানা রকম স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। (আধুনিক মনোবিদ্যাতে বলা হইয়াছে সচেতন জাগ্রত অবস্থা এবং গভীর অচেতন নিদ্রিত অবস্থার মধ্যবর্তী স্তরে প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা ও বাস্তবতা লইয়া যে নিষ্ক্রিয় কল্পনার রূপ দেখা দেয় তাহাকেই স্বপ্ন বলা হয়।)

গভীর প্রসুপ্তিতে স্বপ্ন দর্শন হয় না।

এই আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়ঃ (১) স্বপ্ন মনের ক্রিয়া (২) ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনকারী ব্যক্তিসত্তা নিদ্রিত হইলেও তাহার মন জাগ্রত অবস্থায় যাহা যাহা করিয়াছে বা শুনিয়াছে সেই বিষয়গুলিই স্বপ্নে পরিস্ফুরিত হয়। (৩) যাহা যাহা ঐ ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা দৃষ্ট শ্রুত বা

অনুভূত হয় নাই তাহা কখনও স্বপ্নাবেশে দৃষ্ট হয় না। (৪) বহিরিন্দ্রিয়গণকে মন যাহা যাহা ভোগ করাইয়া থাকে অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়গণের যাহা যাহা ভোগ্য অন্তর্মনেরও তাহা তাহাই ভোগ্য বিষয়। অর্থাৎ মনেরও অতীত অন্তর্মন বলিয়া আর একটি সত্তার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ঐ অন্তর্মন কর্তৃক গৃহীত সুখদুঃখাদি স্বপ্নরূপে প্রকাশমান হয়।

সুশ্রুত কথিত ভূতাত্মা ও ডল্লনের ভাষ্যের অন্তর্মন

স্বপ্নের শ্রেণী বিভাগ ঃ

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—

দৃষ্টং শ্রুতানুভূতঞ্চ প্রার্থিতং কল্পিতং তথা।
ভাবিকং দোষজঞ্চৈব স্বপ্নং সপ্তবিধং বিদুঃ।
তত্রপঞ্চবিধং পূর্বমফলং ভিষগাদিশেৎ।
দিবাস্বপ্নমতিহ্রস্বমতিদীর্ঘঞ্চ বুদ্ধিমান্।

(চরক সংহিতা, ঐ ঐ শ্লোক—৩০)

পণ্ডিতেরা স্বপ্নকে এই সপ্তবিধ শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। দৃষ্টশ্রুত, অনুভূত, প্রার্থিত, কল্পিত, ভাবিক এবং দোষজ ভেদে জাত স্বপ্ন। দোষজ ভেদে জাত স্বপ্নের অর্থ হইতেছে বাতজ, পিত্তজ বা কফজ প্রকৃতির লোকেরা যে স্বপ্ন দেখিতে অভ্যস্ত। (এই দোষজ ভেদের প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যক্তিত্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।)

এই সাত প্রকার স্বপ্নের মধ্যে পাঁচ প্রকারের স্বপ্ন নিষ্ফল হয় বলিয়া চিকিৎসকগণ বলেন। এ ছাড়াও দিবাস্বপ্ন অতি হ্রস্ব বা অতি দীর্ঘ স্বপ্নও নিষ্ফল হয়।

বাগভট বলিয়াছেন—

দৃষ্টঃ শ্রুতোঽনুভূতশ্চ প্রার্থিতঃকল্পিতস্তথা
ভাবিকো দোষজশ্চেতি স্বপ্নঃ সপ্তবিধোমতঃ
তে স্বাদ্যা নিষ্ফলাঃ পঞ্চ যথাস্ব প্রকৃতির্দিবা।
বিস্মৃতো দীর্ঘহ্রস্বোঽতি পূর্বরাত্রে চিরাৎ ফলম্।

(অষ্টাঙ্গ হৃদয় শারীর স্থান, দূতাদি বিজ্ঞানীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক—৬১।৬২)

বাগভটের মতে প্রথম পাঁচটি যেমন নিষ্ফল প্রকৃতিজাত স্বপ্নও তেমনি নিষ্ফল।

টীকাকার মৃগাঙ্ক দত্ত বলিয়াছেন—

দোষজঃ স স্বপ্নো যো বাতজঃ পিত্তজঃ কফজো বা যথাযথং দোষাণামনুরূপোঽন্তঃ সংবিত্তাবনুভূয়তঃ ইতি।

তাহাদের ঐ সব স্বপ্ন তাহাদের প্রকৃতি হইতে জন্মে অর্থাৎ তাহাদের দেহ ও মনের গঠনের মত ঐ সব স্বপ্নও তাহাদের প্রকৃতিজাত। সুতরাং প্রকৃতিজাত স্বপ্ন নিষ্ফল। এবং এই সমস্ত স্বপ্ন দৃষ্ট শ্রুত বা প্রার্থিত কোনও পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত হয় না।

সফল ও নিষ্ফল স্বপ্ন :—

স্বপ্নের সফলতা সম্বন্ধে কি ধারণা করা যায়? স্বপ্নে দৃষ্ট কোনও ঘটনা পরবর্ত্তী সময়ে বাস্তবে রূপায়িত হইলে তাহাকে সফল স্বপ্ন বলা যায়। উপরোক্ত সমস্ত আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে রোগগ্রস্ত নয় এমন মানুষের অধিকাংশ স্বপ্নই নিষ্ফল। জাগ্রত অবস্থায় যাহা দেখা যায়, শোনা যায়, চিন্তা করা যায়, অনুভব করা যায়, কল্পনা করা যায়, মনে মনে যে সকল বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা করা যায় তাহারাই যখন স্বপ্নে ফিরিয়া আসে তখন প্রায় সকল স্বপ্নই নিষ্ফল। একমাত্র ভাবিক স্বপ্ন সফল হয়।

ভাবিক স্বপ্ন সম্বন্ধে অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের টীকাকার মৃগাঙ্ক দত্ত বলিয়াছেন :—

যশ্চ দৃষ্ট শ্রুতাদিভ্যঃ স্বপ্নেভ্যোঽন্যো বিলক্ষণঃ। স্বপ্নো যথা দৃশ্যতে সুপ্তাবস্থায়মুত্তরকালং তথৈব স্বপ্নদর্শিনা নরেণ তন্মুখাবগত তদর্থৈরপি প্রত্যক্ষতো দৃশ্যতে স ভাবিকঃ।

এই স্বপ্ন দৃষ্ট শ্রুতাদি স্বপ্নের অপেক্ষা অন্য প্রকার এবং ভবিষ্যতে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে দৃষ্ট ঐ বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করে। এইরূপ স্বপ্নকে ভাবিক ভাবিক স্বপ্ন স্বপ্ন বলা হয়। কার্যতঃ ভাবিক স্বপ্নের ফলাফল ভবিষ্যতের বিচারের অপেক্ষা রাখে। কোনটি যে ভাবিক স্বপ্ন তাহা আগে হইতে ধারণা করা কঠিন। উত্তরকালে বাস্তবজীবনে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় ঘটিলে তখনই বলা যাইবে যে ঐ স্বপ্ন ভাবিক স্বপ্ন ছিল। আগে হইতে কোন স্বপ্ন ভাবিক স্বপ্ন হইতে পারে ইহা নির্দ্ধারণের প্রচেষ্টায় আচার্যগণ কিছু

সময় নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাবিক স্বপ্ন কোনগুলি হইতে পারে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—

দৃষ্টঃ প্রথমরাত্রে যঃ স্বপ্নঃ সোঽল্প ফলোভবেৎ।
ন স্বপেদ যঃ পুনর্দৃষ্টা স সদ্যঃ স্যাম্মহাফলঃ॥
অকল্যাণমপি স্বপ্নং দৃষ্টবা তত্রৈব যঃ পুনঃ।
পশ্যেৎ সোমং শুভাকারং তস্য বিদ্যাচ্ছুভং ফলম্॥

(চরক সংহিতা ঐ অধ্যায়, শ্লোক—৩২)

রাত্রির প্রথমভাগে যে স্বপ্ন দেখা যায় তাহার ফল অল্পই হয়। অর্থাৎ ভাবিক স্বপ্ন হিসাবে তাহা প্রায় নিষ্ফল। যে স্বপ্ন দেখিবার পর আর নিদ্রা হয় না তাহার সদ্যসদ্যই ফল দেখা যায়। যে ব্যক্তি কোন অমঙ্গলজনক স্বপ্ন দেখিয়া আবার সেই নিদ্রাতেই শুভ স্বপ্ন দেখে তাহার ঐ স্বপ্নগুলি জনিত শুভ ফললাভ হইয়া থাকে।

বাগভট বলেন—

দৃষ্টঃ করোতি তুচ্ছঞ্চ গোসর্গে তদহর্মহৎ
নিদ্রয়া চানুপহতঃ প্রতীপৈর্বচনে স্তথা।

(বাগভট অষ্টাঙ্গ হৃদয়, শারীর স্থান, ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক—৬৩)

গবাদি পশুকে যখন গোয়াল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ প্রাতঃকালে দেখা স্বপ্ন তুচ্ছ ফল দান করে। আবার শেষ রাত্রের স্বপ্ন নিদ্রা দ্বারা ব্যাহত না হইলে সফল হয়।

সুশ্রুত বলেন—

যথাস্বং প্রকৃতিস্বপ্নো বিস্মৃতো বিহতশ্চ যঃ
চিন্তাকৃতো দিবাদৃষ্টো ভবন্ত্যফলদাস্তুতে।

(সুশ্রুত সংহিতা সূত্র স্থান, ২৯ অধ্যায়, বিপরীতাবিপরীত দূত বিজ্ঞান অধ্যায়, শ্লোক—১৩)

বাতজ, পিত্তজ প্রভৃতি প্রকৃতিজাত স্বপ্ন—যে স্বপ্নের কথা জাগ্রতাবস্থায় স্মরণ থাকে না, যে স্বপ্ন অন্য স্বপ্নের দ্বারা বিহত অর্থাৎ পর পর অনেক স্বপ্ন দ্বারা পূর্ব স্বপ্ন আচ্ছাদিত হয় এবং অত্যধিক চিন্তা দ্বারা যে স্বপ্নের উৎপত্তি হয় এবং দিনের বেলায় যে স্বপ্ন দেখা হয় সবই নিষ্ফল। দেখা

যাইতেছে সুস্থ ব্যক্তির অধিকাংশ স্বপ্নই সফল হয় না। কিন্তু সকল আচার্য-গণই রোগীর স্বপ্নের ফলাফল সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন।

বাগভট বলিয়াছেন—

মনোবহানাং পূর্ণত্বাৎ স্রোতসাং প্রবলৈর্মলৈঃ
দৃশ্যন্তে দারুণাঃ স্বপ্না রোগী যৈর্যাতিপঞ্চতাম্‌।
আরোগঃ সংশয়ং প্রাপ্য কশ্চিদেব বিমুচ্যতে

(অষ্টাঙ্গ হৃদয় শারীর স্থান, ষষ্ঠ অধ্যায়, দূতাদি বিজ্ঞানীয়মধ্যায়, শ্লোক—৬০)

মনোবহ স্রোতসকল কুপিত মল দ্বারা পূর্ণ হইলে রোগী অপ্রশস্ত স্বপ্ন দেখে এবং মরণ প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিলে রোগীর মৃত্যু হয়। বাগভট এক্ষেত্রে রোগীর স্বপ্নের কথাই বলিয়াছেন। দেখা যাইতেছে স্বপ্ন-দর্শন ফল বিচার করিতে হইলে স্বপ্ন দর্শনকারীদেরও দুইটি শ্রেণীতে বিভাগ করিতে হইবে। সুস্থ ব্যক্তির ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্বপ্ন। সুস্থ ব্যক্তির স্বপ্ন প্রায়শঃই নিষ্ফল হয়। কিন্তু রোগীর স্বপ্নের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় তাহাদের স্বপ্ন বিভিন্ন প্রতীকের মধ্য দিয়া রোগীর আরোগ্য বা মৃত্যু অথবা রোগের গুরুতর পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে।

আয়ুর্বেদে যাহাকে অরিষ্ট লক্ষণ বলা হয় সেই অরিষ্ট লক্ষণ বিচারের সময়ও রোগীর স্বপ্নকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়। এখানে অরিষ্ট লক্ষণ কাহাকে বলে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এক একটি রোগে কতকগুলি লক্ষণের কথা বর্ণিত আছে যাহাকে অরিষ্ট লক্ষণ বলা হয়। ঐ লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলে রোগীর বাঁচিবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। ইহার মধ্যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি রোগের নিদান এবং লক্ষণের মধ্যেই নিহিত থাকে।

যেমন অভিন্যাস জ্বরে চিকিৎসককে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে ঐ রোগীকে মৃত মনে করিয়াই চিকিৎসা করিবে। আবার আর এক ধরণের অরিষ্ট লক্ষণ পরোক্ষভাবে আবির্ভূত হয়। এগুলি পুষ্পিত ইন্দ্রিয়, গোময় চূর্ণীয় অধ্যায় সকলে বর্ণিত আছে। এগুলি এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়।

নানা রকমের অপ্রত্যক্ষ অরিষ্ট লক্ষণের মধ্যে রোগীর স্বপ্নকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সেইজন্যই মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—

পূর্ব রূপাণ্যথ স্বপ্নান্ য ইমান্ বেত্তিদারুণান্
ন স মোহাদ সাধ্যেষু কর্ম্মাণ্যারভ্যতে ভিষক।

(চরক সংহিতা ইন্দ্রিয় স্থান, পঞ্চম অধ্যায়, পূর্ব্বরূপীয় অধ্যায়, শ্লোক—৩৩)

যে চিকিৎসক এই সকল পূর্বরূপ এবং দারুণ (অর্থাৎ অপ্রশস্ত বা অমঙ্গলজনক) স্বপ্নতত্ত্ব অবগত আছেন তিনি মোহবশতঃ অসাধ্য রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে আচার্যগণ অধিকাংশ স্বপ্নকেই নিষ্ফল স্বপ্নের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। কিন্তু রোগীর স্বপ্ন সম্বন্ধে তাঁহারা রীতিমত শঙ্কিত। রোগীর স্বপ্নগুলি কিন্তু কার্যতঃ প্রতীক হিসাবেই গণ্য করা হইয়াছে। কারণ আপাত দৃষ্টিতে বর্ণিত স্বপ্নগুলি রোগের লক্ষণের সহিত সামঞ্জস্যহীন। অথচ স্বপ্নগুলি বিশেষ বিশেষ রোগের পরোক্ষ অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

জ্বরিতানাং শুনাসখ্যং কপিসখ্যন্তু শোষিণাং
উন্মাদে রাক্ষসৈ প্রেতৈরপস্মারে প্রবর্ত্তনং।
মেহাতিসারিণাং তোয়পানং স্নেহস্য কুষ্ঠিনাং
গুল্মেষু স্থাবরোৎপত্তিঃ কোষ্ঠে মূর্দ্ধি শিরোরুজি॥
শস্কুলী ভক্ষণং ছর্দ্যামধ্বা শ্বাস পিপাসায়োঃ।
হারিদ্রং ভোজনং বাপি যস্যস্যাৎ পাণ্ডুরোগিণঃ
রক্তপিত্তী পিবেদ্যশ্চ শোণিতং স বিনশ্যতি॥

(সুশ্রুত সংহিতা সূত্রস্থান, ২৯শ অধ্যায়, শ্লোক—১৪)

জ্বররোগী কুকুরকে আদর করিতেছে এইরূপ দেখিলে এবং যক্ষ্মারোগী বানরের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছে এইরূপ যদি দেখে তবে তাহার ব্যাধি কঠিন হইবে এমনকি মৃত্যুও হইতে পারে। উন্মাদ ব্যক্তির ত কথাবার্ত্তা বলিবার স্থিরতা নাই তবুও যদি সে দেখে যে রাক্ষসের সহিত মেলামেশা করিতেছে বা মৃগীরোগী যদি দেখে যে প্রেতের (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির) সহিত সখ্য স্থাপন করিতেছে তাহা হইলে ঐ ঐ রোগ অত্যন্ত জটিল হইয়া তাহার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। গুল্মরোগী যদি দেখে যে তাহার পেটের ভিতরে গাছ জন্মাইয়াছে—পুরাতন মাথা ব্যথার রোগী যদি দেখে যে তাহার মাথায় গাছ জন্মাইয়াছে—বমির রোগী যদি পিঠা খাইবার স্বপ্ন দেখে—শ্বাসের রোগী যদি পথ হাঁটিতে হাঁটিতে পরিশ্রান্ত হইয়া তাহার শ্বাস কষ্ট হইতেছে এমন স্বপ্ন দেখে তবে তাহাদের পক্ষে অমঙ্গলদায়ক হয় এই স্বপ্নগুলি।

পাণ্ডুরোগী (কামলা এবং রক্তশূন্যতার রোগী) যদি হরিদ্রা খাইবার স্বপ্ন দেখে—রক্তপিত্তরোগী (যে কোনও দ্বার হইতে রক্ত ক্ষরণের রোগী) যদি স্বপ্নে রক্তপান করিতেছে এইরূপ দেখে তবে তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়। এই প্রতীকগুলির কিছু কিছু বাস্তবানুগ অর্থ অনুমান করা যায়। যেমন গুল্ম এক জাতীয় অর্বুদ (Tumour) ইহা পেটের ভিতরের কোন যন্ত্র অর্থাৎ অন্ত্র বা জরায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। কাজেই গুল্মরোগীর পেটে গাছ জন্মাইবার স্বপ্ন ঐ গুল্ম জন্মাইবার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায়। পাণ্ডুরোগীর হরিদ্রা ভক্ষণ বা রক্ত পিত্ত রোগীর রক্তপান সব স্বপ্নই মূল রোগের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু জ্বররোগীর কুকুরের সহিত এবং যক্ষ্মা রোগীর বানরের সহিত বন্ধুত্ব এই প্রতীকগুলির ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। আয়ুর্বেদাচার্যগণের পর্যবেক্ষণের ফল বলিয়াই মনে হয়।

রোগের পূর্বরূপ ও স্বপ্নদৃষ্ট প্রতীক সমূহ ঃ—

রোগ হয় নাই অথচ কতকগুলি স্বপ্নের মধ্য দিয়া সেই ভবিষ্যৎ রোগ-গুলির আগমনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এগুলিও প্রত্যক্ষভাবে ভাবিক স্বপ্ন নহে। বরং প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত স্বপ্ন বলা যায়। পূর্বেকার সাত রকম শ্রেণী বিন্যাসের কোনটার মধ্যেই এই স্বপ্নগুলিকে স্থান দেওয়া যায় না। একটি কথা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ যে রোগের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইবার আগে ঐ রোগের সুপ্ত লক্ষণ কিছু কিছু শরীরে ক্রিয়াশীল হয় (আধুনিক রোগ বিজ্ঞানে যাহাকে incubation period বলা হয়)। এই সময়টিতে রোগের প্রভাবে শরীরের অভ্যন্তরে কোষ সকলে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিতে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। যেহেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে চিকিৎসাযোগ্য পুরুষ শরীর মন ও আত্মা এই তিনের সমবায়ে তিনটি স্তম্ভযুক্ত গৃহের মত—সুতরাং শরীরের সামান্যতম বিকৃতিতেও মনের উপর তাহার কিছু কিছু প্রভাব দেখা দিবেই। শরীরের সমস্ত রোগই বায়ু, পিত্ত, কফ—এই তিন দোষের অসমতার ফলে অথবা ইহাদের কোনটি কুপিত হইবার ফলে সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই কুপিত দোষের কিছু চাপ মনের উপর পড়িবেই। মনের উপরে কুপিত দোষ সমূহের ঐ ক্রিয়ার ফলেই ঐ রকমের স্বপ্ন মানুষ দেখে। এই স্বপ্নগুলি আংশিকভাবে বাতজ, পিত্তজ বা কফজ প্রকৃতির স্বপ্নের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে। মিশ্রিত স্বপ্নের আকার ধারণ করিতে পারে। আবার সম্পূর্ণ বিকৃতভাবে উপস্থিত হইতেও পারে। একথা স্পষ্ট যে বহু পর্যবেক্ষণ

এবং স্বপ্নের ফলাফল অনুসরণ করিবার ফলেই এই প্রতীকগুলির অর্থ এবং তাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবপর হইয়াছে। এইসব স্বপ্নের পর স্বপ্নদর্শনকারী কি কি রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল—দীর্ঘকাল এই বিষয়ে নানারূপ পর্যবেক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টির প্রভাব এই প্রতীকগুলিকে রোগের পূর্ব-রূপ হিসাবে চিহ্নিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। (আধুনিক মনোবিদগণ মানসিক রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য মনোবিশ্লেষণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া স্বপ্নে দেখা ঘটনাগুলির মধ্য হইতে নানা রকমের প্রতীককে নানা রকমের মনোবাসনার দ্যোতক বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই প্রতীক সবগুলিই মানসিক রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আয়ুর্বেদ মতে প্রতিটি শরীরের রোগের সহিত মনের নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। যেহেতু স্বপ্নদর্শন মনের ক্রিয়া সেহেতু যে কোন শারীর রোগে শরীরের সহিত মনের সামান্যতম বিকৃতিও যথোচিত স্বপ্নের সৃষ্টি করিতে পারে। এবং এক একটি রোগে স্বপ্নও এক এক রকম হইতে পারে। তবে বিভিন্ন ব্যক্তিতেও প্রায় এক রকমের বা একই সাদৃশ্যযুক্ত হওয়াই সম্ভব।) পূর্বরূপ হিসাবে এই স্বপ্ন দর্শনের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হইলেও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাধারণতঃ লোকে স্বপ্নের কথা মনে রাখে না—সামান্যভাবে মনে থাকিলেও স্পষ্টভাবে কেহ বলিতে পারে না। তাছাড়া চিকিৎসকগণও স্বপ্ন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। মোটের উপর এই ব্যাপারের উপরে কেহ কোন গুরুত্ব দেন না। কাজেই স্বপ্ন দর্শনের মধ্য দিয়া রোগের পূর্বরূপের প্রতিফলন হইতে পারে কিনা ইহার অনুসন্ধান বর্তমানে হয় নাই। তবে প্রাচীন আচার্যগণ পূর্বরূপ হিসাবে যে সব স্বপ্নের কথা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় আত্রেয় ধন্বন্তরি বাগভট শার্ঙ্গধর সকলেই সামান্য ইতর বিশেষ মানিয়া লইয়া রোগের পূর্বরূপ হিসাবে একই রকমের প্রতীকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—

> শ্বভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈর্বাপি যাতি যো দক্ষিণাং দিশম্‌
> স্বপ্নে যক্ষ্মা তমাবিশ্য ন জীবন্নব সৃজ্যতে ॥ ৬
> প্রেতৈঃ সহ পিবেন্মদ্যং স্বপ্নে যঃ কৃষ্যতে শুনা।
> স ঘোরং জ্বরমাসাদ্য ন জীবেন্ন চ সৃজ্যতে ॥ ৭
> রক্তস্রগ্রক্ত সর্বাঙ্গেন রক্ত বাসা মুহুর্হসন্‌।
> যঃ স্বপ্নে হ্রিয়তে নার্য্যা স রক্ত প্রাপ্যসীদতি ॥ ১০

লতা কণ্টাকিনী যস্য দারুণা হৃদি জায়তে।
স্বপ্নে গুল্মস্তমন্তায় ক্রুরো বিশতি মানবম্ ॥ ১১
নগ্ন স্যাজ্যাবিসিক্তস্য জুহ্বতোঽগ্নিমনর্চিষম।
পদ্মান্যুরসি জায়ন্তে স্বপ্নে কুষ্ঠৈর্মবিষ্যতঃ ॥ ১৩
স্নেহং বহুবিধং স্বপ্নে চাণ্ডালৈঃ সহ যঃ পিবেৎ।
বধ্যতে স প্রমেহেন স্পৃশ্যতেঽন্তায় মানবঃ ॥ ১৫
নৃত্যন্ রক্ষোগণৈঃ সার্দ্ধং যঃ স্বপ্নেঽম্ভসি সীদতি।
স প্রাপ্য ভৃশমুন্মাদং যাতি লোকমতঃ পরম্ ॥ ১৯
মত্তং নৃত্যন্তমাবিধ্য প্রেতো হরতি যঃ নরম।
স্বপ্নে হরতি তং মৃত্যুরপস্মার পুরঃ সরঃ ॥ ২০

(চরক সংহিতা ইন্দ্রিয় স্থান, পঞ্চম অধ্যায়, পূর্বরূপীয় অধ্যায়)

যে লোক স্বপ্নে দেখে যে কুকুর, উট বা গাধায় চড়িয়া দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিতেছে তাহার যক্ষ্মারোগ হয়।৬

যে স্বপ্নে দেখে যে পরিচিত মৃত ব্যক্তিদের সহিত বসিয়া মদ্যপান করিতেছে অথবা কুকুর তাহাকে টানিয়া নিতেছে, তাহার ঘোরতর জ্বর রোগ হয়। সে ঐ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে অথবা অনেক ভুগিয়া বাঁচিতেও পারে।৭

স্বপ্নে লাল কাপড় পরিয়া, লাল মালা গলায় দিয়া, সর্বাঙ্গে রক্ত মাখিয়া, হাস্যময়ী রমণীর সহিত ভ্রমণ করিতেছে দেখিলে তাহার রক্তপিত্ত রোগ হয়।৯

হৃদয় হইতে কাঁটাযুক্ত লতাগুল্ম জন্মিবার স্বপ্ন দেখিলে তাহার গুল্ম রোগ হয়। ঐ রোগে তাহার মৃত্যুও হইতে পারে।১১

যদি কেহ স্বপ্নে দেখে যে সে উলঙ্গ হইয়া সর্বাঙ্গে ঘৃত মাখিয়া শিখাহীন অগ্নির পাশে বসিয়া আছে অথবা তাহার বুকে পদ্মফুল জন্মিয়াছে তবে তাহার দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি হয়।১৩

যে স্বপ্নে দেখে যে সে চণ্ডালগণের সহিত বসিয়া নানারূপ স্নেহ পদার্থ পান করিতেছে (ঘৃত, তৈল, ননী প্রভৃতি) তাহার প্রমেহ রোগ জন্মে।১৪

স্বপ্নে যে ব্যক্তি রাক্ষসগণের সহিত নাচিতে নাচিতে শেষ পর্যন্ত জলে ডুবিয়া যায় সে কিছুদিনের মধ্যে উন্মাদ রোগাক্রান্ত হয়।১৯

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে সে আনন্দে নাচিতেছে এমন সময় কোনও প্রেত

(মৃত ব্যক্তি) তাহার পা উপর দিকে তুলিয়া মাথা নীচু দিকে ঝুলাইয়া তাহাকে লইয়া যাইতেছে তবে তাহার অপস্মার (মৃগী রোগ) হয়।২০

এইসব স্বপ্ন রোগগুলির পূর্বরূপ হিসাবে রোগী কর্তৃক দেখা যাইতে পারে। তবে দেখিবেই এমন কোনও নিয়ম নাই।

বাগভট তাহার অষ্টাঙ্গ হৃদয় গ্রন্থে শারীর স্থানের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণনাই দিয়াছেন। সামান্য সামান্য বৈলক্ষণ্য থাকিলেও লক্ষণগুলি প্রায় একইরূপই—

স্বপ্নে মদ্যং সহ প্রেতৈর্যঃ পিবন্ কৃষ্যতে শুনা।
স মর্ত্যো মৃত্যুনা শীঘ্রং জ্বররূপেন নীয়তে ॥৪৩
রক্তমাল্য বপুর্বস্ত্রো য হসন্ হ্রিয়তে স্ত্রিয়া।
সোঽস্র পিত্তেন মহিষ-শ্ব-বরাহোষ্ট্রগর্দভৈঃ
যঃ প্রযাতি দিশং যাম্যাং মরণং তস্য যক্ষ্মণা ॥৪৪
লতা কণ্টকিনী বংশস্তালো বা হৃদি জায়তে
যস্যা তস্যাশুগুল্মেন যস্যাবহ্নি মনার্চিষম ॥৪৫
জুহুতো ঘৃতসিক্তস্য নগ্নস্যোরসি জায়তে
পদ্মং স নশ্যেৎ কুষ্ঠেন চণ্ডালৈঃ সহ যঃ পিবেৎ
স্নেহং বহুবিধং স্বপ্নে স প্রমেহেণ নশ্যতি ॥৪৬
উন্মাদেন জলে মজ্জেদ্ যো নৃত্যন্ রাক্ষসৈঃ সহ।
অপস্মারেণ যো মর্ত্যো নৃত্যন্ প্রেতেন নীয়তে।৪৭
অপূপশস্কুলীর্জগ্ধা বিবুদ্ধস্তদ্বিধং বমন্।
ন জীবত্যক্ষি রোগায় সূর্যাচন্দ্রগ্রহণেক্ষণম্
সূর্যাচন্দ্রমসোঃ পাতদর্শনং দৃগ্ বিনাশনম্।৪৯

এই বর্ণনাগুলির মধ্যে নূতন যে স্বপ্ন পাওয়া গেল তাহা হইতেছে যে স্বপ্নে সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ দেখে তাহার চক্ষুরোগ হইতে নিষ্কৃতি থাকে না। আর সূর্য্য বা চন্দ্র আকাশ হইতে খসিয়া পড়িতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিলে তাহার দৃষ্টি নাশ হয়। এইসব স্বপ্নই শারীরিক বিকারের মানসিক প্রতি-ক্রিয়া বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। (পর্য্যবেক্ষণের উপায় থাকিলে বর্তমান কালের চিকিৎসকগণও রোগীকে স্বপ্নাদির বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তবে বর্তমান যুগ পরিবর্তনের ফলে স্বপ্ন পরিবেশও ভিন্ন হইতে পারে। যেমন, রাক্ষসগণের সহিত নৃত্য অথবা চণ্ডালগণের সহিত স্নেহ

পানের স্বপ্ন কাহারও পক্ষে দেখা সম্ভব নহে। কারণ এ যুগে রাক্ষস জাতি কল্পনার সামগ্রী এবং চণ্ডালগণও শ্মশানের অধিপতি নহে। এবং সাপ্তাহিক স্নেহপানের বিধিও প্রচলিত নাই।) রোগীর স্বপ্নের সহিত অরিষ্ট লক্ষণের সম্বন্ধ এবং স্বপ্নের দ্বারা রোগের পূর্বরূপ নির্ণয়ের কথা আলোচিত হইল।

এইবার সুস্থ মানুষের স্বপ্ন কিসের প্রতীক বহন করে তাহা আলোচনা করিব। স্বপ্নের অর্থবহ প্রতীকগুলি অনেক ক্ষেত্রেই স্বপ্নের ফলকে প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রকাশ করে না। আবার অনেক স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় যে মাঙ্গলিক ক্রিয়া বা মঙ্গল চিহ্নাদি দেখা যায় অথবা যে চিহ্নগুলির সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাস আছে যে ঐ চিহ্নগুলি মঙ্গল আনয়ন করে সেইগুলিকেই প্রকাশ করে। ঐ সব মাঙ্গলিক চিহ্ন বা ক্রিয়াদি স্বপ্নে দেখিলেও নিশ্চয়ই মন প্রসন্ন হয়। যেমন—

দেবান্ দ্বিজান্ গো বৃষভান্ জীবতঃ সুহৃদো নৃপান্
সমিদ্ধমগ্নিং বিপ্রাংশ্চ নির্মলানি জলানি চ
পশ্যেৎ কল্যাণ লাভায় ব্যাধেরপগমায় চ।

(সুশ্রুত সংহিতা সূত্রস্থান, ২৯শ অধ্যায়, বিপরীতাবিপরীত দূত শকুন দর্শন অধ্যায়)

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো, বৃষ, জীবিত বান্ধবগণ রাজা প্রজ্জলিত মাঙ্গলিক অগ্নি, ব্রাহ্মণ এবং নির্মল জলাশয় এই সমস্ত স্বপ্নে দেখিলে সুস্থ ব্যক্তির মঙ্গল হয় এবং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাধির উপশম হয়।

বাগভট বলেন—

দেবান্ দ্বিজান্ গো বৃষভান্ জীবতঃ সুহৃদো নৃপান্
সাধূন্ যশস্বিনো বহ্নিমিদ্ধং স্বচ্ছান্ জলাশয়ান্।৬৬
কন্যাং কুমারকান্ গৌরান্ শুক্ল বস্ত্রান্ সুতেজসঃ।
নরাসনং দীপ্ততনুং সমন্তাদ্ রুধিরোক্ষিতঃ।৬৭

(অষ্টাঙ্গ হৃদয় শারীর স্থান, ষষ্ঠ অধ্যায়)

আরো কিছু লক্ষণ যোগ হইয়াছে, যথা—গৌরী কন্যা বা গৌরবর্ণ বালক শুক্ল বস্ত্র ইত্যাদি। এ ছাড়া সবই একরকমেরই। সুন্দর মনুষ্য বাহিত যান বা চতুর্দিক সূর্যোদয়ের মত রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে।

এ সমস্তই বহু প্রচলিত মঙ্গল চিহ্ন হিসাবে মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাইয়াছে। কাজেই এইসব চিহ্ন স্বপ্নে দেখিলে মনে বিশ্বাস জন্মে যে

সত্বরই বাস্তব জগতেও মঙ্গল লাভ হইবে। এগুলিকে প্রত্যক্ষ প্রতীক বলিয়া গণ্য করাই যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু এ সমস্ত ছাড়া কিছু পরোক্ষ প্রতীকের কথা সব আচার্যই উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি আপাত দৃষ্টিতে কোনও মঙ্গল চিহ্নের রূপ হিসাবে মানুষের মনে দাগ কাটে নাই অথচ স্বপ্নে এ সমস্ত দেখিলে সুস্থ ব্যক্তির মঙ্গল হয় এবং অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—

মহা প্রাসাদ ফল বৃক্ষ বারণ পর্বতান্।
আরোহেদ্ দ্রব্য লাভায় ব্যাধেরপগমায় চ।
নদীনদ সমুদ্রাংশ্চ ক্ষুভিতান্ কলুষোদকান্
তরেৎ কল্যাণ লাভায় ব্যাধেরপগমায় চ।
উরগো বা জলৌকো বা ভ্রমরো বাপিয়ং দশেৎ
আরোগ্যং নির্দিশেত্তস্য ধনলাভঞ্চ বুদ্ধিমান্।

(সুশ্রুত সংহিতা সূত্র স্থান, ২৯শ অধ্যায়, শ্লোক—১৬)

উচ্চ অট্টালিকা, ফলবান বৃক্ষ, হস্তী ও পর্বতে স্বপ্নে আরোহণ করিলে লাভের নিমিত্ত হয় এবং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির রোগ উপশম হয়। স্বপ্নে সমুদ্র নদনদী অথবা পঙ্কিল জলরাশি পার হইলে উপরোক্ত ফললাভ হয়। স্বপ্নে সর্প দংশন জোঁক বা ভ্রমরের দংশন অনুভব করিলেও উপরোক্ত ফল হয়।

বাগভট বলেন—

শৈল প্রাসাদ সফল বৃক্ষ সিংহ নরদ্বিপান্
আরোহেদ্ গোহশ্বযানঞ্চ তরেন্নদহ্রদোদধীন্।
পূর্বোত্তরেণ গমনমগম্যাগমনং মৃতম্।
সম্বাধান্নিঃ সৃতির্দেধৈঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দনম্।
রোদনং পতিতোত্থানং দ্বিষতাং চাবমর্দনম্।
যস্য স্যাদায়ুরারোগ্যং বিত্তং বহু চ সোহশ্নুতে।

(বাগভট অষ্টাঙ্গ হৃদয়, শারীর স্থান, ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক—৬৯-৭০-৭১)

পাহাড়, পর্বত, প্রাসাদ, ফলবান বৃক্ষ, নরযান প্রভৃতিতে আরোহন গো-যান বা অশ্ব যানে পূর্ব বা উত্তরদিকে যাওয়া—নদনদী, হ্রদ, সমুদ্র অতিক্রম। অগম্যাগমন—অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের সহিত যৌন সঙ্গম উচিত নয় এমন স্ত্রীলোকের সহিত যৌন সঙ্গম, নিজের মরণের স্বপ্ন, পিতৃপুরুষের

স্বারা সম্বর্ধিত হইবার স্বপ্ন, ক্রন্দন করা, পড়িয়া যাইয়া আবার ওঠা, শত্রুকে পরাজিত করিবার স্বপ্ন—সমস্তই আয়ু আরোগ্য এবং বহু ধন লাভের দ্যোতক।

শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন—

তীর্ত্বা কলুষ নীরাণি জিত্বা শত্রুগণানপি।
আরুহ্য সৌধ গো শৈল করিবাহান সুখী ভবেৎ।
শুভ্র পুষ্পাণি বাসাংসি মাংস-মৎস্য ফলানি চ
প্রাপ্যাতুরঃ সুখী ভূয়াৎ স্বস্থোধনমবাপ্নুয়াৎ।
অগম্যাগমনং লেপোবিষ্ঠয়ারুদিতং মৃতি
আমমাংসাশনং স্বপ্নে ধনারোগ্যাপ্তয়ে বিদুঃ
জলৌকা ভ্রমরীসর্পোমক্ষিকা বাপি যং দশেৎ
রোগী স ভূয়াদরোগঃ স্বস্থোধনমবাপ্নুয়াৎ।

শার্ঙ্গধর, তৃতীয় অধ্যায়, ২০।২২।২৩।২৪

শার্ঙ্গধরের উল্লিখিত স্বপ্নও সুশ্রুত ও বাগভটের মতই। তবে মৎস্য-মাংস ফললাভ বা কাঁচা মাংস ভোজনের স্বপ্ন অধিক বলা হইয়াছে। এ ছাড়া শরীরে বিষ্ঠালেপের স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—অথচ এ পদার্থ সমস্তই স্বপ্নেও ঘৃণার উদ্রেক করে কিন্তু শুভ ফলের প্রতীক হিসাবেই বলা হইয়াছে। অগম্যাগমনের কথা শার্ঙ্গধরও উল্লেখ করিয়াছেন। নিজের মৃত্যু, উচ্চৈঃস্বরে রোদন, সর্প, জলৌকা, ভ্রমর, মক্ষিকা দংশন সব কিছুই কিন্তু স্বপ্নে আনন্দ দান করে না অথচ উহারাই জাগ্রত জগতে মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়

মানসিক ব্যাধি

উৎপত্তি, প্রকার ভেদ এবং লক্ষণ সমূহ ঃ—

পূর্বের মনের সুস্থতা এবং অসুস্থতা অধ্যায়ে মনের অসুস্থতার মৃদু প্রকারগুলির কথা বলা হইয়াছে। যে অসুস্থতায় রোগের লক্ষণ সাধারণের নিকট বোধগম্য হয় না, সাধারণ লোকে তাহাকে উন্মাদ বলে না। রোগী দৈনন্দিন কাজকর্ম সংসার যাত্রা নির্বাহ করে কিন্তু তাহারও মধ্যে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। মাত্র অভিজ্ঞ দৃষ্টির নিকট ঐগুলি ধরা পড়ে। সমাজে এইসব মানুষ সুস্থ মানুষ বলিয়াই পরিচিত হয়। রোগী নিজেও তাহার রোগ সম্বন্ধে সচেতন হয় না—অনেক সময় ধরাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না বা বুঝিতে চায় না। আচার্যগণের মতে অত্যন্ত সত্ত্বপ্রধান জীবনযাত্রা অবলম্বন না করিলে মৃদু রকমের মনোবৈকল্য কিছু কিছু হইতেই পারে। কিন্তু উন্মাদরোগ সম্পূর্ণ পৃথক। রোগী উন্মাদ হইলে তাহার নিজের কথা-বার্তা বা ক্রিয়াকলাপ যে অসংলগ্ন বা অস্বাভাবিক হইতেছে তাহা বুঝিতে
উন্মাদ রোগ পারে না। সারথীহীন রথের মত তাহার গতি পথভ্রষ্ট। কাজেই এই অধ্যায়ে যে ব্যাধির কথা আলোচনা করা হইবে সেগুলির লক্ষণ প্রকট এবং জনসাধারণের নিকট প্রত্যক্ষ। আচার্যগণ এই সমস্ত রোগকেই উন্মাদ রোগ বলিয়াছেন।

সুশ্রুত বলেন—

মদয়ন্ত্যুদ্গতা দোষা যস্মাদুন্মার্গমাশ্রিতাঃ
মানসোঽয়মতো ব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্তিতঃ

(সুশ্রুত সংহিতা উত্তর তন্ত্র, ৬২তম অধ্যায়, উন্মাদ প্রতিষেধ অধ্যায়, শ্লোক—১)

ডল্লন তাহার নিবন্ধ সংগ্রহে বলিয়াছেন—

প্রবৃদ্ধা দোষা মনোবহা স্রোতাংসি প্রাপ্তাঃ সন্তো—যস্মাৎ মানসং ভ্রময়তি ততোহয়ং মানসো ব্যাধিরিতি সম্বন্ধঃ।

দোষসকল ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হইয়া মনোবাহী স্রোত সকলকে আশ্রয় করিয়া মানসিক ব্যাধি উন্মাদ রোগ সৃষ্টি করে। এখানে দোষসকল বলিতে আমরা দেহজ বায়ু, পিত্ত, কফ এবং মনের দোষ রজ ও তম সবগুলিকেই মনে করিব। যদিও উন্মাদরোগকে মানসিক ব্যাধি বলিয়া প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তবুও শরীরের দোষগুলির প্রভাবে মনের বিকৃতির কথা চিন্তা করিয়াই শ্রেণী বিভাগ করিয়া পৃথক পৃথক লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

উন্মাদ রোগের কারণ ঃ—

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—

বিরুদ্ধদুষ্টাশুচি ভোজনানি
প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাম্
উন্মাদ হেতুর্ভয় হর্ষ পূর্বো
মনোঽভিঘাতো বিষমাশ্চচেষ্টাঃ।২

তৈরল্প সত্বস্য মলাঃ প্রদুষ্টা
বুদ্ধের্নিবাসং হৃদয়ং প্রদূষ্য
স্রোতাংস্যধিষ্ঠায় মনোবহানি
প্রমোহন্তীহ নরস্য চেতঃ।৩

(চরক সংহিতা চিকিৎসিত স্থান, ১৪শ অধ্যায়, উন্মাদ চিকিৎসিত অধ্যায়)

বিরুদ্ধ রকমের আহার বিহার দূষিত ও অশুচি খাদ্য ভক্ষণ, দেবতা গুরু ও দ্বিজগণকে অপমান বা নির্যাতন ভয় হর্ষ প্রভৃতির দ্বারা মনের অভিঘাত অর্থাৎ ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এবং শরীর ও মনের নানা রকমের অসম চেষ্টা সকল দ্বারা অল্পসত্ত্ব ব্যক্তির দোষসকল কুপিত হইয়া বুদ্ধির অধিষ্ঠান যে হৃদয় সেই হৃদয়ে এবং মনোবহ স্রোতসকলে অধিষ্ঠিত হইয়া মানুষের চিত্ত অর্থাৎ চৈতন্যস্থানকে মোহযুক্ত করে। এইভাবে উন্মত্ততা সৃষ্টি হয়।

বাগভট বলেন—

শারীর মানসৈ দুষ্টৈ রহিতাদন্ন পানতঃ
বিকৃতাসাত্ম্যাসমলা দ্বিষমাদুপযোগতঃ।

বিষমস্যাল্প সত্ত্বস্য ব্যাধিবেগ সমুদ্গমাৎ
ক্ষীণস্য চেষ্টা বৈষম্যাৎ পূজ্য পূজা ব্যতিক্রমাৎ।
আধিভিশ্চিত্ত বিভ্রংশাদ্ বিষেণোপবিষেণ চ।
এভির্বিহীন সত্ত্বস্য হৃদি দোষাঃ প্রদূষিতাঃ॥
ধিয়োবিধায় কালুষ্যং হত্বা মার্গান্ মনোবহান্
উন্মাদং কুর্বতে তেন ধী বিজ্ঞান স্মৃতি ভ্রমাৎ॥
দেহী দুঃখসুখঃ ভ্রষ্টো ভ্রষ্ট সারথি বদ্রথঃ।

(অষ্টাঙ্গ হৃদয় উত্তর স্থান, ষষ্ঠ অধ্যায়, উন্মাদ প্রতিষেধ শ্লোকাংশ—৪)

অপকারী অন্নপান আত্মার সাম্যের বিকৃতিকারী দ্রব্যসকল গ্রহণ বিষপান —বিষম চেষ্টা অর্থাৎ শরীর বা মনের ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্যের প্রচেষ্টা— সম্মানীয় বা পূজ্যজনকে অপমান বা নির্যাতন—এই সকল কারণকে উপলক্ষ্য করিয়া অল্প সত্ত্ব অর্থাৎ যাহার সত্ত্বগুণ কম বা সহ্যশক্তি কম এমন মানুষের দোষ সকল (বায়ু, পিত্ত, কফ এবং রজ, তম) প্রকুপিত হইয়া মনোবহ স্রোত সকলকে রুদ্ধ করে। তাহার ফলে চেতনা স্থান হৃদয় আচ্ছন্ন এবং বুদ্ধি কলুষিত হয়। তাহার ফলে বুদ্ধি বিজ্ঞান স্মৃতি প্রভৃতিতে প্রমাদ উপস্থিত হয় এবং রথীবিহীন রথ যেমন পথভ্রষ্ট হইয়া এদিক ওদিক চলিয়া যায় তেমনই মানুষ দুঃখ এবং সুখের বোধ ভ্রষ্ট হইয়া উন্মাদে পরিণত হয়। এই উন্মাদ রোগের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ না হইলে তাহাকে মদ বলে।

সুশ্রুত বলেন—

সচা প্রবৃদ্ধস্তরুণো মদ সংজ্ঞাং বিভর্তি চ।

(সুশ্রুত ৬২তম অধ্যায়, শ্লোক—১)

উন্মাদ রোগ অল্পদিনের এবং অল্প লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে তাহাকে মদ বলা হয়। (বর্তমান মনোবিজ্ঞানে মৃদু মনোবৈকল্য এবং উন্মাদকে দুই শ্রেণীর রোগ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী Neuroses, দ্বিতীয় শ্রেণী Psychoses. Neuroses শ্রেণীতে anxiety states hysteria, obsessional neuroses, reactive depression প্রভৃতি বোঝায়। একমাত্র Hysteria ছাড়া বাকী রোগগুলিতে রোগী ঠিক সারথীহীন রথের মত পথ ভ্রষ্ট হইয়া চলে না। সে নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে। পড়াশুনা চাকুরী সবই করিতে পারে অথচ কতকগুলি লক্ষণে আক্রান্ত হয়। যাহা প্রাসঙ্গিক অঙ্গ সমূহের বিকৃতি জনিত নয়।

(functional) বুক ধড়ফড়ানি অথচ হৃদরোগ নাই কম্পন অথচ মস্তিষ্কের (organic) রোগ নাই। এমনই পেট ফাঁপা, অনিদ্রা, হাত-পা ঝিম ঝিম করা প্রভৃতি অনেক কিছু লক্ষণ অহেতুক ভাবেই হয়। Phobia বা কতকগুলি ঘটনা বা বস্তু বা জন্তু হইতে ভয় অথবা Obsession অর্থাৎ কোন একটা বিশেষ ক্রিয়াতে বাধ্যতামূলক আসক্তি যেমন শুচিবায়ু এ সমস্তই Nuroses এর অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু Psychoses প্রকৃতপক্ষে উন্মাদ রোগই। ইহার মধ্যে Schizo phrenia এবং Paranoia প্রভৃতিতে রোগী যে সব অবাস্তব দৃশ্য দেখে বা দৈববাণী শোনে বা গন্ধ পায় সে সবই সুস্থ মানুষের পক্ষে প্রহেলিকা।

Psycopath বলিয়া যাহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহারা কিন্তু সাময়িক উন্মাদ। আয়ুর্বেদে যাহারা রাক্ষসসত্তা ও পিশাচ প্রকৃতির মানুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—ইহারা তাহাই। যখন ইহারা মনোবৈকল্যে আক্রান্ত হয় তখন ইহাদের স্থায়ী প্রকৃতি ইহাদের এত দূর নিয়া যাইতে পারে যে নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন, হত্যা প্রভৃতিও করিতে পারে।)

শ্রেণী বিভাগ ঃ—

আয়ুর্বেদাচার্যগণ উন্মাদ রোগকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আয়ুর্বেদের মূল ধারা অনুসরণে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, মানসিক কারণ জনিত এবং বিষপানের ফলজনিত।

সুশ্রুত বলেন—

একৈকশঃ সমস্তৈশ্চ দোষৈরত্যর্থ মূর্চ্ছিতৈঃ
মানসেন চ দুঃখেন স পঞ্চবিধ উচ্যতে।
বিষাদ্ ভবতি ষষ্ঠশ্চ যথাস্বং তত্র ভেষজম্।

(সুশ্রুত, ঐ শ্লোক—১)

বাগভট বলেন—

উন্মাদাঃ ষট্ পৃথগ্দোষনিচয়াধি বিষোদ্ভবাঃ
উন্মাদো নাম মনসোদোষৈরুন্মার্গগৈর্মদঃ

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ষষ্ঠ অধ্যায়, উন্মাদ প্রতিষেধ অধ্যায়, উত্তর স্থান)

যদিও বিভিন্ন দোষ ঘটিত উন্মাদরোগে লক্ষণও ভিন্ন হয় তবুও সাধারণ ভাবে কতকগুলি লক্ষণ সব রকমের উন্মাদ রোগেই বিদ্যমান থাকে।

আত্রেয় বলেন—

ধী বিভ্রমঃ সত্ত্বপরিপ্লবশ্চ
পর্য্যাকুলা দৃষ্টিরধীরতা চ
আবদ্ধ বাক্‌ত্বং হৃদয়ঞ্চ শূন্যং
সামান্যমুন্মাদগদস্য লিঙ্গম্‌ ॥৪

সমূঢ় চেতা ন সুখং ন দুঃখং
নাচারধর্মৌ কুত এব শান্তিম্‌ ।
বিন্দত্যপাস্তস্মৃতি বুদ্ধি সংজ্ঞো
ভ্রমত্যয়ং চেত ইতশ্চেতশ্চ ॥৫

(চরক সংহিতা, চিকিৎসিত স্থান, ১৪শ অধ্যায়, শ্লোক—৪।৫)

ভিন্ন ভিন্ন দোষ হইতে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন উন্মাদরোগে পৃথক রকমের লক্ষণ বর্ণিত হইলেও কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে যাহা সব রকমের উন্মাদ রোগেই বিদ্যমান থাকে। সেগুলির বর্ণনাতেই মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—বুদ্ধির বিভ্রান্তি, সত্ত্বগুণের বিপর্যয়, দৃষ্টির আকুলভাব, অস্থির মন, অসংলগ্ন কথাবার্তা এবং হৃদয়ে শূন্যভাব, এই অবস্থায় সুখ, দুঃখ, ধর্ম অনুষ্ঠান আচার বিচার কিছুই তাহাকে শান্তি দেয় না। তাহার স্মৃতি নষ্ট হয়, বুদ্ধি জ্ঞান সবই তাহাকে ত্যাগ করে। তাহার চিত্ত অস্থিরভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াই চলে কখনও স্থির হইতে পারে না। কেবলমাত্র মানসিক কারণে অর্থাৎ মনের অভিঘাত জন্য যে উন্মাদ রোগ হয় তাহার কারণ বর্ণনায়—

চোরৈর্নরেন্দ্রপুরুষৈররিভিস্তু থান্যৈ
র্বিত্রাসিতস্য ধনবান্ধব সংক্ষয়াদ বা ।
গাঢ়ং ক্ষতে মনসি চ প্রিয়য়া রিরংসো
র্জায়েত চোৎকটতমো মনসোবিকারঃ ।
চিত্রং য জল্পতি মনোহনুগতং বিসংজ্ঞো
গায়ত্যথো হসতি রোদতি চাপি মূঢ়ঃ ।

(সুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র, ৬২ অধ্যায়, উন্মাদ প্রতিষেধ, শ্লোক—৭)

চোর বা দস্যুদিগের কারণে অত্যন্ত ভীত অবস্থায় দীর্ঘদিন যাপন অথবা রাজপুরুষের ভয়ে অস্থিরতার মধ্যে জীবন যাপন। বলশালী শত্রুর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন—এই সবের ফলেও উন্মাদ রোগ হইতে পারে। ধনহানি,

অত্যন্ত প্রিয় আত্মীয় বা বান্ধব হানির জন্য গভীর শোক হইতেও মানসিক ব্যাধি হইতে পারে।

কোন প্রিয় স্ত্রী বা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রিয় পুরুষের আসঙ্গ লাভের অপূর্ণ ইচ্ছা মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিতে পারে এবং সেই মানসিক ক্ষত হইতেই উন্মাদ রোগ হইতে পারে। এই সব কারণে উন্মাদ হইলে রোগী যে রকমের মনের অভিঘাত হইতে উন্মত্ত হইয়াছে সেইসব বিষয়গুলি মনে জল্পনা কল্পনা করিতে থাকে এবং স্থান-অস্থান বিস্মৃতি হেতু সেগুলি প্রকাশও করিতে থাকে। কখনও হয়ত শোকে অভিভূত হইয়া কাঁদিতে থাকে। কখনও বা হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া গান করিতে থাকে বা হাসিতে আরম্ভ করে, কখনও মূঢ়ের মত অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

বাগভট মানসিক কারণে উন্মাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ধন কান্তাদিনাশেন দুঃসহেনাভিষঙ্গবান্।
পাণ্ডুর্দীনো মুহুর্মুহ্যন্ হাহেতি পরিদেবতে
রোদিত্যকস্মাত্ ম্রিয়তে তদগুণান্ বহুমন্যতে।
শোকক্লিষ্টমনা ধ্যায়ন্ জাগরূকো বিচেষ্টতে॥

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, উত্তর স্থান, উন্মাদ প্রতিষেধ নাম, ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক—৮)

ধন বা প্রিয়ানাশের ফলে দুঃসহ শোকে অভিভূত মানুষ মনের আঘাত হেতু উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়। তাহার মুখ পাণ্ডুর হয়। অত্যন্ত দীন-ভাব তাহাতে প্রকাশ পায়। পুনঃ পুনঃ হা-হা শব্দ করিয়া বিলাপ করে, মৃত প্রিয়জনের বহুগুণ কল্পনা করে এবং তাহা সকলকে বলে। এইসব বলিতে বলিতে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলে, নিদ্রাহীন হয়।

এই অধ্যায়ে উন্মাদ রোগীর লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া আমরা ত্রিদোষজ উন্মাদের লক্ষণ সমূহ আলোচনা হইতে বিরত থাকিব। কারণ ঐগুলিকে সম্পূর্ণরূপে মানসিক রোগ বলা যায় না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আগ্রহের সৃষ্টি যাহা করে তাহা হইল—আয়ুর্বেদে বর্ণিত গ্রহোন্মাদ বা ভূতোন্মাদ রোগীর লক্ষণসমূহ। এইসব বিশেষ রোগের লক্ষণসমূহের বর্ণনা দিবার পূর্বে একটুখানি ভূমিকার প্রয়োজন আছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানসিক রোগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা উল্লেখ না করিলে এই অধ্যায়ের সম্পূর্ণতা আসিবে না। সেইজন্যই তুলনামূলক আলোচনা অনিবার্য হইয়া

পড়ে। পরে বর্ণিত গ্রহোন্মাদগণ নানাপ্রকার মায়িক দৃশ্য দেখিয়া থাকে এবং ঐ সকল দৃশ্য বা অদৃশ্য সত্ত্বার নিকট হইতে আদেশ অনুজ্ঞা প্রভৃতি পায় এবং বাস্তব জগতে তদনুরূপ আচরণ করে। বর্তমানে বর্ণিত Schizophrenia (চিত্তভ্রংশী বাতুলতা) বা Paranoia (ভ্রম বাতুলতা) এই দুই প্রকারের উন্মাদরোগীই অন্য লোকের অদৃশ্য অননুভূত দৃশ্যাদি দেখে বা অনুভব করে।

এই বিষয়ে বিশেষ রূপ উল্লেখযোগ্য হইতেছে—এই আয়ুর্বেদশাস্ত্র যে যুগে রচিত হইয়াছিল এই সমস্ত ভ্রম বাতুলতা বা চিত্তভ্রংশী বাতুলতার রোগীগণ সেই যুগের পারিপার্শ্বিকতা হইতে মায়িক দৃশ্যাবলীর উপাদান আহরণ করিত। যেমন স্বপ্নের কথা ধরা যাউক। উন্মাদ রোগের পূর্বরূপ স্বরূপ স্বপ্ন দর্শনের ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে ব্যক্তি রাক্ষসগণের সহিত নৃত্য করিতে করিতে জলে ঝাঁপ দিবার স্বপ্ন দেখে সে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়। বর্তমান যুগে কাহারও সহিত রাক্ষসগণের পরিচয় নাই...। যেহেতু অদৃষ্ট-পূর্ব কোনও দৃশ্যই স্বপ্নে আসিতে পারে না, সেহেতু রাক্ষসের সহিত নৃত্যও কেহ স্বপ্নে দেখিতে পারে না। চিত্তভ্রংশী বাতুলতা ইত্যাদিতে রোগী যে সব মায়িক দৃশ্য দেখে (Hallucination or illusion) সমস্তই পারিপার্শ্বিকতা হইতে সংগৃহীত। এখানে পারিপার্শ্বিকতা বলিতে রোগীর চারিপার্শ্বের সামাজিক আচার বিচার, পুস্তকাদিতে বর্ণিত বিষয় বা নাটকে দেখা দৃশ্য প্রভৃতিকে বুঝায়। এই সমস্ত বিষয়ই রোগীর মনে প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলনের সহিত রোগীর স্বভাব এবং আশা আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হইয়া কতকগুলি অলীক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। সেইগুলিই রোগী প্রত্যক্ষ করে। এই পশ্চাৎপট মনের সম্মুখে রাখিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। আচার্যগণ গ্রহোন্মাদ রোগের লক্ষণাদি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন সমস্তই সেই যুগের রোগী, সেই যুগের পারিপার্শ্বিকতা হইতে গ্রহণ করিয়া নিজে সেই অলীক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিত।

মনে করা যাউক, সেই যুগে মৃত পিতামাতা, আত্মীয় প্রভৃতির শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া বহুপ্রচলিত সামাজিক প্রথা ছিল এবং সাধারণ মানুষের মনে ঐ সমস্ত ক্রিয়ার একটি নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া ছিল। কাজেই ঐ যুগের কোনও উন্মাদ ঐ সকল মায়িক দৃশ্য দেখিত এবং তদনুরূপ আচরণ করিত যাহা বর্তমান দিনের রোগী নাও দেখিতে বা করিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে অদৃষ্টপূর্ব বা

অশ্রুতপূর্ব দৃশ্যাদি বা বাক্যালাপ কখনও কল্পনায় প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন একজন ভারতীয় কৃষকের ভ্রম বাতুলতার দৃশ্য মধ্যে ল্যাপল্যাণ্ডের কোনও দৃশ্য প্রত্যক্ষ হইবে না বা সে গির্জায় যাইয়া বিবাহ সাজে বিবাহ করিবে না। কিন্তু সে রাম, কৃষ্ণ বা কালীর সহিত অনায়াসেই কথোপকথন করিবে অথবা সীতার বিবাহ দৃশ্যও দেখিতে পারিবে।

কাজেই ভ্রম বাতুলতা বা চিত্তভ্রংশী বাতুলতায় আক্রান্ত রোগী তখনকার যুগে যে যে রকম আচরণ করিত—তাহার মধ্যে ক্রোধ, ভয়, হর্ষ, শোক, রিরংসা এইগুলি ছাড়াও যে যে অদ্ভুত আচরণ করিত সেই সমস্ত লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য স্থাপন করিয়া সংহিতাকারগণ গ্রহোন্মাদ বা ভূতোন্মাদ আখ্যা দিয়াছেন। একথা সত্য যে নিশ্চয়ই সংহিতাকারগণ কল্পনার সাহায্যে এই লক্ষণগুলি লিপিবন্ধ করেন নাই। এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত রোগী নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত। তবে বর্ণিত লক্ষণগুলি বর্তমানে সর্বাংশে দেখা না গেলেও অধিকাংশ লক্ষণই বিভিন্ন রকমের ভ্রম বাতুলতায় দেখা যায়। কারণ ভূত, প্রেত, দেবতা প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী লোক সর্বকালেই আছে।

ভূতোন্মাদ বলিয়া যে উন্মাদগণের লক্ষণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে তাহাদের আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। লক্ষণ যেমনই হউক ইহারা কিন্তু সকলেই রোগগ্রস্ত, কেহই সুস্থ নহে। প্রথমে ঐগুলির লক্ষণসমূহ বর্ণনা করা যাক।

১। দেবগ্রহ অধিকৃত—

সন্তুষ্টঃ শুচিরপি চেষ্ট গন্ধ মাল্যো।
নিস্তন্দ্রোহ্যবিতথ সংস্কৃতপ্রভাষী।
তেজস্বী স্থির নয়নো বরপ্রদাতা
ব্রহ্মণ্যো ভবতি চ যঃ স দেবজুষ্টঃ॥

(সুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র, অধ্যায় ৬০, অমানুষ প্রতিষেধ অধ্যায়, শ্লোক—৪)

দেবগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি সন্তুষ্ট মনে বসিয়া থাকে। শুচি অবস্থায় পুষ্প, ধূপ, মালা, চন্দন প্রভৃতির গন্ধে প্রীত হয়। নিদ্রাহীন অবস্থাতে থাকে। জ্ঞানগর্ভ শুদ্ধ কথা বলিতে ভালবাসে। তেজস্বী এবং পলকহীন নেত্রযুক্ত হয়। লোককে বরদানের প্রবণতা দেখা যায়।

বাগভট বলেন—

ফুল্লপদ্মোপমমুখং সৌম্যদৃষ্টিমকোপণম্ ।
অল্পবাক্ স্বেদবিন্মূত্রং ভোজনানভিলাষিণম্ ॥
দেবদ্বিজাতি পরমং শুচিসংস্কৃতবাদিনম্ ।
মীলয়ন্তং চিরান্নেত্রে সুরভিং বরদায়িনম্ ॥
শুক্লমাল্যাম্বর সরিচ্ছৈলোচ্চভবন প্রিয়ম্ ।
অনিদ্রমপ্রধৃষ্যঞ্চ বিদ্যাদ্দেব বশীকৃতম্ ॥

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, উত্তর স্থানম্, ৪র্থ অধ্যায়, ভূতবিজ্ঞানমধ্যায়, শ্লোক—১৩।১৪।১৫)

ফোটা পদ্মের মত সৌন্দর্যময় মুখমণ্ডল, শান্ত এবং ক্রোধহীন আকৃতি, অল্প অল্প কথা বলা, অশুচিদ্রব্য আহারে বীতস্পৃহা, দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা, জ্ঞান-গর্ভ বাক্য বলার প্রবৃত্তি। স্থির অচঞ্চল চোখের দৃষ্টি, সুগন্ধ দ্রব্যপ্রিয়তা। শুভ্র শুচি বস্ত্র পরিধানে ইচ্ছা, উচ্চ প্রাসাদ পাহাড় এবং সরোবরপ্রিয়তা এবং নিদ্রাহীনতা—এই সবই দেবগ্রহ আক্রান্তের লক্ষণ।

২। দেবশত্রু বা অসুরগ্রহ আক্রমণের লক্ষণ—

সংস্বেদী দ্বিজগুরু দেব দোষ বক্তা
জিহ্মাক্ষো বিগতভয় বিমার্গ দৃষ্টিঃ ।
সন্তুষ্টো ভবতি নচান্নপানজাতৈর্দুষ্টাত্মা
ভবতি চ দেব শত্রু জুষ্টঃ ।

(সুশ্রুত, ঐ, ঐ, শ্লোক—৫)

অত্যন্ত ঘর্ম প্রবণতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবতার নিন্দা করিতে ইচ্ছা, কুটিল ও নির্ভীক চোখের দৃষ্টি, নাস্তিক্য, প্রচুর আহারেও অতৃপ্তি এবং ভয়ঙ্কর স্বভাব এইগুলি অসুর আক্রান্ত উন্মাদের লক্ষণ।

বাগভট বলেন—

জিহ্মদৃষ্টিং দুরাত্মানং গুরু-দেব-দ্বিজ দ্বিষম্
নির্ভয়ংমানিনং শূরং ক্রোধনং ব্যবসায়িনম্ ।১৬
রুদ্রঃ স্কন্দো বিশাখোঽহমিন্দ্রোঽহমিতি বাদিনম্ ।
সুরামাংসরুচিং বিদ্যাৎ দৈত্যগ্রহগৃহীতকম্ ।১৭

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ঐ, ঐ, শ্লোক—১৬।১৭)

দৃষ্টি কুটিল—অন্যায় কার্য করিবার ইচ্ছাযুক্ত, ধর্মকর্ম প্রভৃতির নিন্দা-কারী নিজেকে মহামান্য ব্যক্তি বলিয়া দম্ভ করা ; নিজেকে অত্যন্ত বলশালী লোক বলিয়া প্রচার করা ; আমার অধীনেই সকলে কার্য করে এইরূপ চিন্তা ও প্রচার ; মাংস মদ্য সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা—এ সমস্তই অসুর গ্রহ পীড়িত উন্মাদের লক্ষণ।

৩। গন্ধর্বগ্রহ পীড়িতের লক্ষণ—

হৃষ্টাত্মা পুলিন বনান্তরোপসেবী
আচারঃ প্রিয় পরিগীত গন্ধমাল্যঃ
নৃত্যন্ বা প্রহসতি চারুচাল্প শব্দং
গন্ধর্বগ্রহ পরিপীড়িতো মনুষ্যঃ।

(সুশ্রুত, ঐ, ঐ, শ্লোক—৬)

যে উন্মাদ প্রফুল্ল মনে নদীতীর, উদ্যান প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে, নৃত্যগীতে প্রীত হয় এবং নিজে অনুরূপ আচরণ করে এবং অল্প কথা বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে তাহাকে গন্ধর্বগ্রহ পীড়িত বলিয়া মনে করা যায়।

বাগভট বলেন—

সাচারং সুরভিং হৃষ্টং গীতনর্তনকারিণম্।
স্নানোদ্যানরুচিং রক্তবস্ত্রমাল্যানুলেপনম্
শৃঙ্গারলীলাভিরতং গন্ধর্বাধ্যুষিতংবদেৎ ॥

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ঐ, ঐ, শ্লোক—১৮)

পরিচ্ছন্ন আচার, সুগন্ধের প্রতি অনুরাগ, গীত, নৃত্য, উদ্যান, মাল্য, রক্ত বস্ত্রপ্রিয়তা, নানারূপ বিলাস ও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ গন্ধর্বগ্রহ পীড়িত উন্মাদে দেখা যায়।

৪। যক্ষগ্রহ পীড়িতের লক্ষণ—

তাম্রাক্ষঃ প্রিয়তনুরক্তবস্ত্রধারী গম্ভীরো
দ্রুতমতিরল্পবাক্ সহিষ্ণুঃ।
তেজস্বী বদতি চ কিং দদামি কস্মৈ যো।
যক্ষগ্রহ পরিপীড়িতো মনুষ্যঃ ॥

(সুশ্রুত, ঐ, ঐ, শ্লোক—৭)

তাম্রাভ রক্তবর্ণ চক্ষু, মনোহর দেহধারী, রক্ত বস্ত্রের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন গম্ভীর স্বভাব অথচ অব্যবস্থিত চিত্ত, অল্পভাষী কিন্তু সহিষ্ণু অর্থাৎ ক্রোধ পরায়ণ নহে। সর্বদাই কাহাকে কি দান করিব বলিয়া ঘোষণা করে যে উন্মাদ সে যক্ষগ্রহ পীড়িত হইয়াছে বোঝা যায়।

বাগভট বলেন—

বিপ্লুতং ভ্রস্তরক্তাক্ষং শুভগন্ধং সুতেজসম্।
প্রিয়-নৃত্য-কথা-গীত-স্নান-মাল্যানুলেপনম্।
মৎস্যামাংসরুচিং হৃষ্টং তুষ্টং বলিনমব্যথম্।
চলিতাগ্রকরং কস্মৈ কিং দদামীতি বাদিনম্।
রহস্যভাষিণং বৈদ্যদ্বিজাতিপরিভাবিণম্।
অল্পরোষং দ্রুতগতিং বিদ্যাদ্যক্ষ গৃহীতকম্।

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ঐ, ঐ, শ্লোক—২১।২২।২৩)

উদ্ভ্রান্ত রক্ত চক্ষু বিশিষ্ট সুগন্ধ নৃত্যগীত কথা, স্নান, মাল্য, অনুলেপন (প্রসাধন) প্রিয়। মৎস্য-মাংস প্রিয়, প্রফুল্ল, সর্বদা কাহাকে কি দিব এই প্রশ্ন করা, সকলের সহিত রহস্যপূর্ণ কথাবার্তা বলা, অল্পগতি এবং মনের অব্যবস্থিতত্ব—এই সমস্ত লক্ষণ যক্ষগ্রহ পীড়িত উন্মাদরোগে দেখা যায়।

৫। পিতৃগ্রহাবিষ্ট উন্মাদ—

প্রেতেভ্যো বিসৃজতি সংস্তরেষু পিণ্ডাণ্
শান্তাত্মা জলমপি চাপসব্য বস্ত্রঃ
মাং সেপ্সুস্তিলগুড়পায়সাভিকামস্তদ্ভক্তো
ভবতি পিতৃগ্রহাভিভূতঃ।

(সুশ্রুত, ঐ, ঐ, শ্লোক—৮)

যে কুশের উপরে মৃত ব্যক্তির নাম করিয়া অন্নাদি পিণ্ডদান করে, দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ করিয়া মাংস, তিল, গুড়, পায়স প্রভৃতি খাইতে ইচ্ছা করে তাহাকে পিতৃগ্রহের দ্বারা আক্রান্ত উন্মাদ বলিয়া জানিবে।

বাগভট বলেন—

অপ্রসন্নদৃশং দীন বসনং শুষ্কতালুকম্।
চলন্নয়নপক্ষ্মাণং নিদ্রালুং মন্দ পাবকম্।

অপসব্যপরীধানং তিলমাংস গুড় প্রিয়ম্ ।
স্খলম্বাচঞ্চ জামীয়াৎ পিতৃগ্রহবশীকৃতম্ ।

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ঐ. ঐ. শ্লোক—৩৯।৪০)

অপ্রসন্ন দৃষ্টি, মলিন বদন, মুখের ভিতরে শুষ্কভাব, কম্পমান চোখের পাতা, নিদ্রালুতা, ক্ষুধামান্দ্য, দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরীয় স্থাপন, তিল, মাংস, গুড় প্রিয়তা, স্খলিত বচন—এই সব লক্ষণ পিতৃগ্রহাভিভূত উন্মাদ রোগে দেখা যায় ।

৬ । সর্পগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ—

ভূমৌ যঃ প্রসরতি সর্পবৎ কদাচিৎ ।
সৃক্কণ্যৌ বিলিহতি জিহ্বয়া প্রসক্তং ।
নিদ্রালুগুড়মধুপায়সেপ্সুর্বিজ্ঞেয়ো
ভবতি ভুজঙ্গমেনজুষ্টঃ ।

(সুশ্রুত, ঐ, ঐ. শ্লোক—৯)

যে উন্মাদ কখনও মাটিতে শুইয়া বুকে হাঁটে—দুই ওষ্ঠপ্রান্ত জিহ্বা দ্বারা লেহন করে, নিদ্রাপ্রিয় হয়, গুড়, মধু ও পায়স ভোজনে অভিলাষী হয় তাহাকে সর্পগ্রহাবিষ্ট বলিয়া জানিবে ।

বাগভট বলেন—

রক্তাক্ষং ক্রোধনং স্তব্ধদৃষ্টিং বক্রগতিংচলম্
শ্বসন্তমনিশং জিহ্বালালিনং সৃক্কণীলিহম্
প্রিয়দুগ্ধগুড় স্নানমধোবদনশায়িনম্
উরগাধিষ্ঠিতং বিদ্যাত্রস্যন্তঞ্চাতপত্রতঃ ।

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ঐ, ঐ, শ্লোক—১৯।২০)

রক্তচক্ষু, কোপন স্বভাব, অপলক দৃষ্টি, বক্রগতি, ফোঁস ফোঁস শব্দ সহকারে নিঃশ্বাস ত্যাগ, জিহ্বা দ্বারা সৃক্কণী লেহন, দুগ্ধ, গুড়, স্নানপ্রিয়তা, অধোবদনে শয়ন এবং রৌদ্রভীতি—এই সমস্তই সর্পগ্রহাভিভূত উন্মাদের লক্ষণ ।

৭ । রাক্ষসগ্রহজুষ্ট উন্মাদ—

মাংসাসৃগ্বিবিধসুরাবিকারো লিপ্সুর্নির্লজ্জো

ভৃশমতি নিষ্ঠুরোঽতি শূরঃ
ক্রোধালুর্বিপুলবলো নিশাবিহারী
শৌচাদ্বিড়্ ভবতি চ রক্ষসা গৃহীতঃ।

(সুশ্রুত, ঐ, ঐ, শ্লোক—১০)

যে উন্মাদ মাংস রক্ত নানাবিধ মদ্যপানে আসক্ত হয়, যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলশালী এবং কোপন স্বভাবের হয়, রাত্রিতে নিদ্রা না যাইয়া ভ্রমণে অভিলাষী হয় এবং অপরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে—তাহাকে রাক্ষসগ্রহাভিভূত উন্মাদ বলা হয়।

বাগভট বলেন—

সক্রোধদৃষ্টিং ভ্রূকুটিমুদ্বহন্তং সসম্ভ্রমম্।
প্রহরন্তং প্রধাবন্তং শব্দন্তং ভৈরবাননম্।
অন্নাদ্বিনাপি বলিনং নষ্টনিদ্রং নিশাচরম্।
নির্লজ্জমশুচিং শূরং ক্রূরং পরুষভাষিণম্।
রোষণং রক্তমাল্য স্ত্রীরক্তমদ্যামিষপ্রিয়ম্।
দৃষ্টবা চ রক্তং মাংসং বা লিহানং দশনচ্ছেদী।
হসন্তমন্নকালে চ রাক্ষসাধিষ্ঠিতং বদেৎ।

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ঐ, ঐ, শ্লোক—২৬।২৭।২৮)

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, ভ্রূকুটিযুক্ত, কখনও দৌড়ায়, কাহাকেও প্রহার করে, মুখের আকৃতি সর্বদা ভীষণ করিয়া থাকে, কম ভোজনেও দেহের বলক্ষয় হয় না, স্বল্পনিদ্র, নির্লজ্জ আচরণকারী, কোপন স্বভাব রুক্ষভাষী, স্ত্রীলোক, মদ্য মাংস প্রিয়, ভোজনে উল্লাসশীল—এ সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে উন্মাদকে রাক্ষসগ্রহাবিষ্ট বলিয়া চিহ্নিত করা যায়।

৮। পিশাচজুষ্ট উন্মাদ—

উদ্ধবস্তঃ কৃশপরুষশ্চির প্রলাপী
দুর্গন্ধো ভৃশমশুচিস্তথাতি লোলঃ
বহ্বাশী বিজন হিমাম্বুরাত্রী সেবী
ব্যাচেষ্টং ভ্রমতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ।

(সুশ্রুত, ঐ, ঐ, শ্লোক—১১)

বিকৃত দর্শন, দুর্বল, রুক্ষভাষী এবং বহু প্রলাপী দুর্গন্ধযুক্ত শরীর,

অপরিচ্ছন্ন, চঞ্চল প্রকৃতি, বহুভোজী ; নির্জনতা, শীতল জল ও রাত্রি যাহার প্রিয়, প্রায়শঃই ক্রন্দন করে যে—এমন লক্ষণবিশিষ্ট উন্মাদকে পিশাচজুষ্ট বলিয়া জানা যায়।

বাগভট বলেন—

অব্যবস্থচিত্তং নৈকত্রাতিষ্ঠন্তং পরিধারিণম্
উচ্ছিষ্ট-নৃত্য-গান্ধর্ব-হাস-মদ্যামিষ প্রিয়ম্।
নির্ভর্ৎসনাদ্দীনমুখং রুদন্তম নিমিত্ততঃ
নখৈর্লিখন্তমাত্মানং রুক্ষধ্বস্তবপুঃস্বরম্।
আবেদয়ন্তং দুঃখানি সম্বন্ধাবন্ধভাষিণম্।
নষ্ট স্মৃতিং শূন্যরতিং লোলং নগ্নং মলীমসম্
রথ্যাচেল পরিধানং তৃণমালা বিভূষণম্।
আরোহন্তঞ্চ কাষ্ঠাস্ম তথা সংকরকূটকম্
বহ্বাশিনং পিশাচেন বিজানীয়াদধিষ্ঠিতম্।

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ঐ, ঐ, শ্লোক—২৯।৩০।৩১।৩২)

অস্থিরমতি, সর্বদা একস্থানে থাকে না, উচ্ছিষ্ট মদ্য মাংস প্রিয়, দীনমুখ, অকারণে ক্রন্দনশীল, সর্বদা গাত্র কণ্ডূয়ন করে, আকার এবং স্বর রুক্ষ এবং বিধ্বস্ত দেখায়, সর্বদা নিজের দুঃখের কথা অন্যকে জানায়, অসম্বন্ধ কথা-বার্তা বলে, স্মৃতিভ্রংশতা, লোলুপতা, উলঙ্গপ্রিয়তা অথবা ছিন্নবস্ত্র পরিধান-প্রিয়তা, কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতিতে বসিয়া থাকিতে ভালবাসে, বহুভোজী হয় —এই লক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত উন্মাদকে পিশাচগ্রহাভিভূত উন্মাদ বলিয়া জানা যায়।

এই গ্রহোন্মাদগণকে বর্তমান মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী ভ্রমবাতুলতা এবং চিত্তভ্রংশী বাতুলতার পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। চিত্তভ্রংশী বাতুলতা—Schizophrenia এবং ভ্রমবাতুলতা—Paranoia—এই দুই প্রকারের উন্মাদই অলীক দর্শন (Illusion) অথবা মায়াদর্শন (Paranoia) দ্বারা আক্রান্ত হয়। সামাজিক পরিবেশ, ব্যক্তিগত পরিবেশ এবং সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে এইসব অলীকদর্শন বা মায়াদর্শন ভিন্ন প্রকারের হয়। সেইজন্য এইসব উন্মাদও উন্মত্ত অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন মায়া বা অলীক দর্শনের দ্বারা নিজেকে দেবতা, জ্ঞানী, রাজা, প্রেত, রাক্ষস ইত্যাদির সমতুল্য ভাবিতে থাকে। সেইজন্য তাহাদের অলীক বা মায়াদর্শন অনুযায়ী আচরণকে

আয়ুর্বেদাচার্যগণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রহগণের ধারণা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উন্মাদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (এই প্রসঙ্গে প্রারম্ভিক সূত্রের প্রথম সূত্র স্মরণ করিতে বলি।) সেই যুগের প্রত্যয় অনুযায়ী এই উন্মাদগণের প্রকার-ভেদ নির্ণয় করিলেও মোটের উপর সমস্ত গ্রহোন্মাদগণকে চিত্তভ্রংশী বাতুলতা এবং ভ্রম বাতুলতায় আক্রান্ত রোগীর পর্যায়ে নিশ্চিতভাবে গণনা করা যায়। পূর্বে বলা হইয়াছে ব্যক্তিগত পরিবেশ ইত্যাদি এবং সহজাত প্রবৃত্তি (আয়ুর্বেদাচার্যগণ যাহা পূর্বজন্মার্জিত বলেন) অনুযায়ী এই উন্মাদগণও ভিন্ন ভিন্ন রূপের হয়। এই বিষয়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন। আধুনিক মনোবিদ্যাতে Creative Psychopath, Aggressive Psychopath বলিয়া কিছু কিছু লোককে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এ ছাড়া Inadequate Psychopath বলিয়াও এক শ্রেণীকে চিহ্নিত করা যায়। Aggressive Psychopath-গণ প্রকৃতিতেই রুক্ষ নিষ্ঠুর হয়। অবশ্য কেহ কেহ কথাবার্তায় ভদ্র হইতে পারে। ইহারা হঠাৎ হত্যা, নারীধর্ষণ, নির্মম প্রহার ইত্যাদি করিতে পারে। এই সমস্ত অপরাধের পর ইহাদের মনে কোনরূপ অনুতাপ দেখা যায় না। অবশ্য মৃদুরকমের Aggressive Psychopath-গণ অনেক সময় মৌখিক তর্জন গর্জন গালাগালি দিয়াই ক্ষান্ত হয়। চৌর্য, যৌন অপরাধও ইহাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত মানুষকেই অসুর প্রকৃতি বা রাক্ষস প্রকৃতির পর্যায়ে ব্যক্তিত্ব অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইহারা সুস্থ অবস্থায় থাকিলে হঠাৎ কোন অপরাধ করা ছাড়া বা সকল লোকের সহিত প্রকৃতি অনুযায়ী দুর্ব্যবহার করা ছাড়া বেশীদূর অগ্রসর হয় না। কিন্তু ইহারা যদি ভ্রম বাতুলতা বা চিত্তভ্রংশী বাতুলতায় আক্রান্ত হয় তবে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত হয় অর্থাৎ যে ধরনের অলীকদর্শন বা মায়া-দর্শনের প্রভাবে যে রকমের আচরণ করে সেই সমস্ত লক্ষণকেই আচার্যগণ অসুরগ্রহ রাক্ষসগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত উন্মাদের লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

Creative Psychopath-গণ স্বভাবতঃ ভদ্র। তাঁহারা প্রচুর জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন, মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিতে পারেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই স্থায়ীরূপ নেয় না। ব্যক্তিগত বা সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষা অনুযায়ী সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে উচ্চভাব বা জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অশিক্ষিত লোকের মধ্যে এইরূপ Psychopath কেহ থাকিলে সেও তাহার পারিপার্শ্বিকের তুলনায় অধিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারে। আর উচ্চ

সমাজ ও শিক্ষার পারিপার্শ্বিকতায় Creative Psychopath নিঃসন্দেহেই উচ্চ জ্ঞান বা ভাবের পরিচয় দেয় কিন্তু কোনও ভাবই স্থায়ী হয় না। অস্থায়ী ভাবে প্রকাশ পাইয়া অনেক সময় পরে বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া যায়। এই রকমের মানুষ চিত্তভ্রংশী বাতুলতা বা ভ্রম বাতুলতায় আক্রান্ত হইলে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করে সেইগুলিই আয়ুর্বেদাচার্যগণের মতে দেবগ্রহ, পিতৃগ্রহ, যক্ষগ্রহ এবং গন্ধর্বগ্রহের দ্বারা আবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ।

Inadequate Psychopaths সাধারণতঃ প্রহার হত্যা ইত্যাদি করে না। তবে সাধারণতঃ ইহারা প্রকৃতিতে অসামাজিক অথবা সমাজবিরোধী, সর্বকার্যে অক্ষম, দূরদৃষ্টিহীন এবং ধৈর্যহীন হয়; ধৈর্য না থাকায় কোনও কাজেই উন্নতি করিতে পারে না—এই ধরনের ব্যক্তি Manic Depression রোগে আক্রান্ত হইলে পিশাচগ্রহ জুষ্ট এবং সর্পগ্রহজুষ্ট উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই Inadequate Psychopath-দের জন্মগত মানসিক অসাম্য পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে অথবা অতিপরিশ্রমে, অপুষ্টি এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উষ্ণ আবহাওয়া প্রভৃতি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

Depressive Manic-দের যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়, যথা—চারিদিকের পরিবেশ উপেক্ষা করিয়া চলা, নিজেকে অকর্মণ্য মনে করিয়া শ্লথভাবে কার্য সম্পাদন, অকারণে ক্রন্দন, অকারণে শারীরিক বলহানি—এ সমস্তই সর্পগ্রহ ও পিশাচগ্রহাভিভূত উন্মাদে দেখা যায়।

সহজাত এই সব মানসিক অসাম্য যতক্ষণ না উপযুক্ত কারণ অবলম্বন করিয়া উন্মাদ রোগের পর্যায়ে আসিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তিন রকমের Psychopath-ই সমাজে আর দশজনের মত বসবাস করে। কিন্তু যখন আচার্যগণের মতে যাহা যাহা উন্মাদ রোগের নিদান সেই সেই কারণবশতঃ ঐ অসাম্য ব্যাধির পর্যায়ে আসে তখন তখনই সে সারথিহীন রথের মত পথভ্রষ্ট হইয়া সমাজ বহিভূর্ত হইয়া পড়ে।

পরিশিষ্ট

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে মনোবিদ্যার প্রয়োগ ঃ —

মানুষ যে যে ভাবে চলিলে দেহে ও মনে সুস্থ থাকে তাহার জন্য আয়ুর্বেদাচার্যগণ বহুরকমের বিধি ও নিয়ম পালনের উপদেশ দিয়াছেন। মানুষের প্রাত্যাহিক ক্রিয়া কর্ম ঐ সমস্ত বিধি অনুযায়ী চালনা করিলে সে সুস্থ শরীর ও মন লইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া দিনাতিপাত করিতে পারে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—

সম দোষঃ সমাগ্নিশ্চ সম ধাতু মন ক্রিয়ঃ
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থইত্যভিধীয়তে।

দোষ সমূহ ঃ অগ্নি ধাতু মল—সব কিছুর সমতা রক্ষা করিয়া আত্মা, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনকে প্রসন্নতামণ্ডিত করিয়া জীবন ধারণ করাকেই সুস্থতা বলে। এইরূপ জীবন যাপনের জন্য যে অধ্যায়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাকেই স্বস্থাধিকার বলা হইয়াছে।

ভাবমিশ্র বলেন—

মানবো যেন বিধিনা স্বস্থস্তিষ্ঠতি সর্বদা
তমেব কারয়েদ্বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতম্।
দিনচর্যাং নিশাচর্যাং ঋতুচর্যাং যথোদিতাম
আচরণ পুরুষঃ স্বস্থঃ সদা তিষ্ঠতি নান্যথা।

(ভাবপ্রকাশ, চতুর্থ প্রকরণ, শ্লোক—১২।১৩)

যে সকল বিধি পালন করিলে মানব সুস্থভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে শুভবুদ্ধি চিকিৎসক মানুষকে তাহাই করাইবেন। দিনচর্যা, নিশাচর্যা, ঋতুচর্যা প্রভৃতি বিষয়ে যাহা যাহা উপদেশ দেওয়া হইল সেইগুলি আচরণ করিলে মানুষ সুস্থভাবে বাঁচিতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই। স্বস্থাধিকারে দেহের পক্ষে হিতকর বহুরকমের বিধি যেমন নির্দেশিত হইয়াছে মনের পক্ষে হিতকর বিধিও অনুরূপভাবেই নির্দিষ্ট হইয়াছে।

আমরা যেহেতু এই গ্রন্থে মনের নানা বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি সেই হেতু মন সুস্থ সবল এবং উন্নত রাখিবার জন্য আচার্যগণ কি কি নির্দেশ দিয়াছেন তাহাই মাত্র আলোচনা করিব। একথা অবশ্যই স্বীকার করা প্রয়োজন যে দেহ ও মন উভয়ের সুস্থতা না থাকিলে মানবসত্তা পীড়িত হয়। সুতরাং দেহের সুস্থতার বিধিনিয়মগুলিও অঙ্গাঙ্গীভাবেই আসিয়া পড়ে। তাহা হইলেও দেহ সুস্থ রাখিবার জন্য যে নিয়মগুলি উল্লিখিত হইয়াছে—যেমন মলমূত্রাদির বেগধারণ বিষয়ে, আহারাদির বিচারে অথবা স্নান অভ্যঙ্গ মুখ প্রক্ষালন প্রভৃতি বিষয়ে সেই সব আমরা এখানে উল্লেখ করিব না। যে নিয়মগুলি মাত্র মনের উপরই প্রত্যক্ষ ক্রিয়া করে আমরা শুধু সেইগুলিরই উল্লেখ করিব। এই উল্লেখ্য বিষয়গুলির বিশেষত্ব এই যে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মধ্যে সাধারণ বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া মনকে উচ্চতর মার্গে পরি-চালিত করিবার নির্দেশও সমভাবেই দেওয়া হইয়াছে। আয়ুর্বেদকারগণ বলেন—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য আরোগ্য অর্থাৎ সুস্থতা প্রয়োজন।

সুতরাং জীবনের কোনও অংশই বা কোনও ক্রিয়াই উপেক্ষণীয় নহে। এই বোধেই তাঁহারা সর্বকর্মেরই সংযত ও শোভন প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

দিনচর্যা

ব্রাহ্মে মুহূর্তে বুধ্যেত স্বস্থোরক্ষার্থ মায়ুষঃ
তত্র সর্বাঘশান্ত্যর্থং স্মরেদ্ধি মধুসূদনম্।
দধ্যাজ্যাদর্শসিদ্ধার্থ বিল্বগোরোচনাস্রজাম্
দর্শনং স্পর্শনং কার্যং প্রবুদ্ধেন শুভাবহম্

(ভাবপ্রকাশ, চতুর্থ প্রকরণ)

এই নিয়মগুলি সবই মনের প্রসন্নতা সৃষ্টির জন্য। সে যুগে মানুষের মধ্যে নাস্তিক্য ভাব বিশেষ প্রচলিত ছিল না। তাই জাগরণের মুহূর্তে তমোগুণের প্রভাবকে অপসারিত করিয়া সত্ত্বভাব আনিবার জন্য এবং বিপদ-নাশন মধুসূদনকে স্মরণ করিবার জন্য এই ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক ছিল। দধি, ঘৃত, বিল্ব, গোরোচনা প্রভৃতি মঙ্গলদায়ক পদার্থ দর্শন স্পর্শন প্রভৃতিও

এই একই কারণে। তারপর সমস্ত দিন কিভাবে কাটাইতে হইবে তাহার নানা উপদেশের মধ্যে মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—

সর্বপ্রাণিষু বন্ধুভূতঃ স্যাৎ।
ক্রুদ্ধানামনুনেতা ভীতানামাশ্বাসয়িতা
দীনানামভ্যুপপত্তা সত্যসন্ধঃসামপ্রধানঃ
পর পরুষ বচনসহিষ্ণুঃ অমর্ষঘ্নঃ
প্রশমগুণদর্শী রাগদ্বেষ হেতুনাং হন্তা
নানৃতং ব্রুয়াৎ। নানুস্যামা দদ্যাৎ।
নান্যস্ত্রীয়মভিলষেৎ। নান্যশ্রিয়ং ন বৈরং
রোচয়েৎ। ন কুর্যাৎ পাপং
ন পাপেঽপি পাপীস্যাৎ
নান্য দোষান্ ব্রুয়াৎ। নান্যরহস্যমাগময়েৎ।

(চরক সংহিতা, সূত্রস্থান, ৮ম অধ্যায়, শ্লোক—১২)

সকল প্রাণীর প্রতি বন্ধুভাব দেখাইবে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে অনুনয় দ্বারা প্রশমিত করিবে। ভীত ব্যক্তিকে আশ্বাসের দ্বারা নির্ভয় করিবে। দরিদ্র-দিগকে অনুগ্রহ করিবে। সত্যসন্ধ হইবে এবং সামগুণ অবলম্বন করিবে। অন্যে কর্কশ বাক্য বলিলে সহিষ্ণুতা দ্বারা প্রতিহত করিবে—নিজে পরুষ বাক্য ব্যবহার করিবে না। প্রশস্তগুণসমূহের উৎসাহদাতা হইবে। বিদ্বেষের কারণ পরিহার করিবে। মিথ্যা কহিবে না। পরস্ব অপহরণ করিবে না। পরস্ত্রী সম্ভোগে অভিলাষ করিবে না। পরশ্রীকাতর হইবে না। কাহারও শত্রুতাকে নিমন্ত্রণ করিবে না। অপকারীরও অপকার করিবে না। পরের দোষ প্রচার করিবে না। পরের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত রহস্য প্রকাশ করিবে না।

এই উপদেশগুলি পালনের দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। মানুষ সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়াও উচ্চমনের অধিকারী হইতে পারে। এসব ছাড়াও ভদ্র সমাজে বসবাস ও মেলামেশা করিবার জন্য কিছু নিয়ম পালন করা উচিত যাহার ব্যতিক্রমে দৈহিক কোন ক্ষতি না হইলেও মনের দিক দিয়া মানুষের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হইতে হয়।

মহর্ষি আত্রেয় বলেন—

নোচ্চৈর্হসেৎ ন শব্দবন্তং মারুতং মুঞ্চেৎ।
নাসংবৃতমুখো জৃম্ভাং ক্ষবথুং হাস্যং বা প্রবর্তয়েৎ।

ন নাসিকাং কুণ্ডীয়াৎ ন দন্তান্ বিঘট্টয়েৎ। ন নখান্ বাদয়েৎ।
নাস্থীন্যভিহন্যাৎ। ন ভূমিং বিলিখেৎ। ন ছিন্দ্যাৎ তৃণম্।
ন লোষ্ট্রং মৃদনীয়াৎ।

(চরক, ঐ, ঐ, শ্লোক—১৫)

লোকের সম্মুখে উচ্চহাস্য করিবে না বা সশব্দে অধোবায়ু নিঃসরণ করিবে না। মুখ না ঢাকিয়া হাঁচি কাশি প্রভৃতি প্রবর্তন করিবে না। নাসিকা কুঞ্চন দ্বারা অঙ্গ বিকৃতি করিবে না। দন্তবাদ্য বা নখবাদ্য করিবে না। আঙ্গুল মটকাইবে না। ভূমিতে আঁচড় কাটিবে না। ঘাস পাতা ছিঁড়িবে না বা লোষ্ট্র ইত্যাদি চূর্ণ করিবে না।

ন চঞ্চলং মনোঽনুভ্রাময়েৎ
ন বুদ্ধীন্দ্রিয়ানামতিভাবমাদধ্যাৎ
ন চাতিদীর্ঘসূত্রী স্যাৎ
ন ক্রোধ হর্ষাবনুবিদধীত
ন শোকমনুবসেত।

(ঐ, ঐ, শ্লোক—২৩)

চঞ্চল মনকে আরও চঞ্চল করিবে না। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের উপরে অধিক ভার চাপাইবে না। অতি দীর্ঘসূত্রী হইবে না। ক্রোধ বা হর্ষের কারণ ঘটা মাত্র তাহাদের বশীভূত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিবে না। শোকের বশীভূত হইবে না। শোক সম্বরণের চেষ্টা করিবে।

এ সমস্তই মানুষের জীবনের পথে অতি মূল্যবান উপদেশ যাহা মনকে ক্রমশঃ ঘাতসহ করিয়া তুলিতে সাহায্য করে।

ভূষণ ধারণ

ভূষণ ধারণ যদিও দেহের শোভা বর্ধনের জন্যই করা হয়—কিন্তু ঐ ধারণজনিত যে প্রতিক্রিয়া তাহা মনের উপরেই হয়। সেজন্য ভূষণ ধারণের বিধিও উক্ত হইয়াছে।

ভূষণেভূর্ষয়েদঙ্গং যথাযোগ্যং বিধানতঃ।
শুচি সৌভাগ্যসন্তোষদায়কং কাঞ্চনং স্মৃতম্॥

গ্রহদৃষ্টিহরং পুষ্টিকরং দুঃস্বপ্ননাশনম্ ।
পাপদৌর্ভাগ্যশমনং রত্নাভরণধারণম্ ॥

বাসঃ শৃঙ্গার রত্নানাং ধারণং প্রীতিবর্ধনম্ ।
রক্ষোঘ্নমর্থ্যসৌজন্যং সৌভাগ্যকরমুত্তমম্ ॥

সততং সিদ্ধমন্ত্রস্য মহৌষধ্যাস্তথৈব চ ।
রোচনা সর্ষপাদীনাং মাঙ্গল্যানাঞ্চ ধারণম্ ॥

(ভাবপ্রকাশ, চতুর্থ প্রকরণ, শ্লোক—৯৯।১০০।১০১।১০২)

এই উপদেশগুলি মানসিক তৃপ্তি ও মনোবল সৃষ্টির উপকরণ হিসাবেই ওয়া হইয়াছে। কেহ রত্ন ধারণে গ্রহদোষ খণ্ডিত হয়—এই প্রকার বিশ্বাস রিলে তাহার এক ধরনের মানসিক বল সৃষ্টি হয়। ভোজনের বিধিতে দেহের ক্ষে হিতকর অন্নপানাদির গুণাগুণ বহু বর্ণিত হইয়াছে। ভোজনের কাল, পাদান, ভোজন পাত্র প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে মনের দিক ইতে ক্রিয়া করিয়া যে যে ব্যবস্থা মানসিক প্রফুল্লতা আনয়ন করে তাহাও ল্লিখিত হইয়াছে।

কারণ—

শরীরে জায়তে নিত্যং বাঞ্ছা নৃণাঞ্চতুর্বিধা
বুভুক্ষা চ পিপাসা চ সুষুপ্সাশ্চ রতিস্পৃহা
ভোজনেচ্ছা বিঘাতাৎ স্যাদঙ্গমর্দোহরুচি শ্রমঃ
তন্দ্রালোচন দৌর্বল্য ধাতুদাহ বলক্ষয়াঃ।

কাজেই ভোজনের যাহাতে ব্যাঘাত না ঘটে তাহার চেষ্টা মানুষকে করিতে হইবে। কারণ ভোজনের ব্যাঘাত ঘটিলে গা ম্যাজ-ম্যাজ ভাব, অরুচি, তন্দ্রা-ভাব ইত্যাদি বহু রোগ উপস্থিত হয়। ভোজনের ব্যাঘাত প্রত্যক্ষ কারণেও হইতে পারে, পরোক্ষ কারণবশতঃও হইতে পারে।

প্রত্যক্ষ কারণগুলি আমাদের আলোচ্য নহে। পরোক্ষ কারণগুলির সহিত মনোবিদ্যার সম্পর্ক আছে সেজন্য তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ততো ভোজন বেলায়াং কুর্যাৎ মাঙ্গল্য দর্শনম্।

ভোজনবেলা উপস্থিত হইলে মঙ্গল প্রদায়ক দ্রব্যাদি দেখিতে হইবে। তারপর ভোজনকালে যেন অন্যের শুভজনক দৃষ্টি ভোজ্য দ্রব্যে পতিত হয়। অশুভ দৃষ্টি পতিত হইলে ভোজ্য দ্রব্য কলুষিত হয়।

পিতৃমাতৃসুহৃদ্বৈদ্য পাককৃদ্ধংস বর্হিণাম।
সারসস্য চকোরস্য ভোজনে দৃষ্টিরুত্তমা ॥

পিতামাতা সুহৃদ-বৈদ্য পাককারী—সারস চকোর প্রভৃতির ভোজনদ্রব্যে উপরে দৃষ্টি শুভজনক বলিয়া কথিত হয়।

আর—

দীনহীন ক্ষুধার্তানাং পাপ পাষণ্ড রোগীণাম্।
কুক্কুটাদি শুনোর্দৃষ্টির্ভোজনেনৈবশোভনা ॥

(ভাব প্রকাশ, চতুর্থ প্রকরণ, শ্লোক—১২১)

দীন, দরিদ্র, ভিক্ষুক, ক্ষুধার্ত, পাপাচরণকারী, রোগী, কুক্কুট, কুকুর প্রভৃতির দৃষ্টি ভোজ্যদ্রব্যে পড়িলে তাহা অশুভ।

রতিস্পৃহা এবং তাহার শান্তি সম্বন্ধে বহুবিধ উপদেশ নির্দিষ্ট আছে। তবে তাহা প্রধানতঃ দৈহিক দিক হইতে পালনীয়। সেইজন্য এখানে উল্লিখিত হইল না।

স্বাস্থ্যাধিকারে মানুষের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি বিষয়ে এত বিশদ আলোচনা সম্ভবতঃ অন্য কোন শাস্ত্রে নাই। অথচ সবই বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত। মনোবিজ্ঞানও তাহাতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

—o—